সুমন্ত আসলাম

বেকুব
নাম্বার
ওয়ান

চতুর্থ মুদ্রণ
ফেব্রুয়ারি ২০১০
তৃতীয় মুদ্রণ
ফেব্রুয়ারি ২০১০
দ্বিতীয় মুদ্রণ
ফেব্রুয়ারি ২০১০
প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০১০

প্রকাশক
মনিরুল হক
অনন্যা
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
কিশোর

কম্পোজ
তন্বী কম্পিউটার্স
৩৮/৪ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
পাণিনি প্রিন্টার্স
৬১ তনুগঞ্জ লেন, সুত্রাপুর, ঢাকা

দাম
একশত বিশ টাকা

ISBN 984 70105 0306 7

Bekub Number One by Sumanto Aslam
Published By : Monirul Hoque, Ananya, 38/2 Banglabazar, Dhaka-1100
First Published : February 2010, Cover Design Kishor
Price : 120.00 Taka Only

U.K Distributor, **Sangeeta Limited**, 22 Brick Lane, London
U.S.A Distributor, **Muktadhara** 37-69, 74 St. 2nd Floor, Jackson Hights, N.Y. 11372
Canada Distributor, **Anyamela**, 300 Danforth Ave., Toronto (1st floor) suite-202
Canada Distributor, **ATN Mega Store**, 2970 Danforth Ave., Toronto

খুব সকালে ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস আমার। ছোট্ট একটা লাইব্রেরি করেছি সাগুফতা হাউজিংয়ের একটা জায়গায়, ছুটির দিন সকালে চলে যাই আমি সেখানে, কাটিয়ে দেই সারাটা দিন—বই পড়ি, লিখি, নাম না জানা হরেকরকম পাখি দেখি, কিছু একটা খাওয়াতে খাওয়াতে গল্প করি প্রতিবেশী কাকদের সঙ্গে, কোনো কোনো দিন একপাওয়ালা কোনো শালিকের সঙ্গে।

শুক্রবার ছিল সেদিন, ৪ সেপ্টেম্বর ২০০৯। লাইব্রেরিতে বসে আছি, ধূসর একটা পাখি দেখছি। হঠাৎ একটা ফোন, সমস্ত পাঁজর ভেঙে দেওয়া ফোন। নদীতে গোসল করতে গিয়ে আমার বড় বোনের একমাত্র ছেলে আর মেঝ বোনের বড় ছেলে—দুজন, একসঙ্গে পানিতে ডুবে মারা গেছে। একই বয়সী ছিল ওরা, চব্বিশ বছরের যুবক ছিল দুজন।

প্রিয় মাহমুদ
প্রিয় নাজমুল

বাবা রে, তোরা তো জানিস-আমি যতটা রাগী মানুষ, আবেগীও ঠিক ততটা। অল্পতেই রেগে যাই, নিশ্চুপ হয়ে যাই আবার অল্পতেই। তোরা আমাকে ক্ষমা করে দিস, বাবা। একা থাকলেই, চুপচাপ কিছু একটা ভাবতে নিলেই, তোরা দুজন এসে আমার পেছনে দাঁড়াস, স্পষ্ট টের পাই আমি সেটা, ঘ্রাণ পাই তোদের পবিত্রতার। স্রষ্টার কাছে আমি প্রতিদিন প্রার্থনা করি—পরজনমে স্রষ্টা যেন আমাকে তোদের মতো বানায়, তোদের মতো শুদ্ধ যুবক হওয়ার আঁকুতি জানাই আমি তার কাছে!

খুব চিন্তা ভাবনা করে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি—প্রতিবছর একটা করে মজার উপন্যাস লিখব। প্রথম লিখলাম—'কঞ্জুস', ২০০৪-এ। সাফল্য পেলাম বেশ, পাঠক সানন্দে গ্রহণ করলেন উপন্যাসটা। চার বছর পর আরেকটা লিখলাম—'মিষ্টার ৪২০', ২০০৮-এ। পাঠক এটাও গ্রহণ করলেন। 'হ্যালো ঠগবাজ' লিখলাম ২০০৯, গতমেলায়। পাঠকের সাড়া আগের মতোই।

এবার লিখলাম—'বেকুব নাম্বার ওয়ান'।

সাধারণত এসব উপন্যাস লিখতে গিয়ে কয়েকটা জায়গায় কিছু কৌতুক ব্যবহার করি আমি। ঠিক হুবহু না, কাহিনীর সামঞ্জস্যতায় কৌতুকটা ঘটনার সাথে মিলিয়ে দেই। এখানে দেশী কৌতুকের পাশাপাশি ইন্টারনেট থেকে পাওয়া কৌতুকও ব্যবহার করি আমি। কৌতুকটা ব্যবহার করার পর সেটা আর কৌতুক থাকে না, মজার একটা কাহিনী হয়ে যায়, ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। এবারও তার ব্যতিক্রম করিনি। আশারাখি, এ মজার উপন্যাসটা ভালো লাগবে আপনাদের।

বি.দ্র.ঃ প্রিয় পাঠক, আপনার যদি কখনো নির্দিষ্ট কোনো সমস্যা হয় কিংবা কোনো মুশকিলে পড়েন আপনি, তাহলে এই বইটা পড়ুন, আপনার সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, মুশকিল আসান হয়ে যাবে আপনার ইনশাল্লাহ। হা-হা-হা।

সুমন্ত আসলাম
সাগুফতা হাউজিং, পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা

বদি ভাই বেকুব কিছিমের মানুষ। ব্যাপারটা আগে টের পাইনি, আজ পেলাম। অথচ তার সঙ্গে চার বছর ধরে মিশি, অধিকাংশ সময় একই সঙ্গে থাকি। যদিও অনেকে তাকে বেকুবই ভাবে, আড়ালে-আবডালে বলেও, কিন্তু কখনো বিশ্বাস করিনি আমি, এমনকি বুঝতেও পারিনি।

ব্যাপারটা আজকে বুঝতে পারার কতগুলো কারণ আছে। তিন চার বছর আগে একটা প্রাইভেট ফার্মে চাকরি করতেন বদি ভাই। নতুন জয়েন করেছেন ওই অফিসে। তিনবার চেষ্টা করার পর রেফার্ডে বি এ পাশ করে আড়াই বছর বেকার ছিলেন। অনেক জায়গায় জীবন-বৃত্তান্ত পাঠিয়েছেন, কিন্তু কেউ কখনো ডাকেনি, তাই ইন্টারভ্যুও দেওয়া হয়নি। হঠাৎ একটা প্রতিষ্ঠান থেকে ডাকা হয় তাকে, ইন্টারভ্যুও দেন তিনি, কিন্তু চাকরি হয় না। শেষে অনেক ধরাধরি করার পর এক আত্মীয়ের সুপারিশে চাকরি হয় তার। দুপুরের দিকে একদিন তার অফিসে গিয়েছি। টেবিলের পাশে একটা খালি চেয়ার এনে বসতে বললেন আমাকে। চা, না কফি খাব—এইটা জিজ্ঞেস করতে না করতেই একটা ফোন আসে তার। রিসিভার না তুলেই তিনি খুব স্টাইল করে হেলান দিয়ে বসেন চেয়ারে। আমি বললাম, 'বদি.ভাই, ফোন।'

হাত দিয়ে থামার ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, 'শোনো রনজু, প্রতিটা অফিসের অফিসারদের একটা অফিস ডেকোরাম থাকে। ফোন আসার সঙ্গে সঙ্গে সেটা যদি রিসিভ করে ফেলি তাহলে ওপাশ থেকে ভাববে আমাদের কোনো কাজকর্ম নেই, টেবিলে চুপচাপ বসে থাকি আর ফোন আসলেই গপ করে ধরে ফেলি।'

ফোনটা কেটে গিয়ে আবার বাজতে থাকে। বদি ভাই এবারও রিসিভারটা তোলেন না। আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে ফোনের স্পিকারটা অন করে বলেন, 'হ্যালোওওওও।'

বদি ভাইয়ের ওইরকম হ্যালো বলা দেখে গলার ভেতর থেকে তীক্ষ্ণ একটা হাসি বের হয়ে এসেছিল প্রায়। কোনোরকমে সেটা চেপে রেখে নিচু করে ফেলি মাথাটা। ফোনের স্পিকার থেকে ভেসে আসে, 'স্যার, আমরা একটা কম্পিউটার ফার্ম থেকে বলছি, আপনাদের অফিসে সম্ভবত অনেকগুলো কম্পিউটার আছে।'

গলা যতটা সম্ভব গম্ভীর করে বদি ভাই বললেন, 'ইয়েস।'

'আপনাদের নিশ্চয় উইন্ডোজ—।'

লোকটাকে কথাই শেষ করতে দিলেন না বদি ভাই, 'আরে, এটা কী বলছেন আপনি! আমাদের অফিস সম্বন্ধে আপনার কোনো ধারনাই নাই।'

'আসলে আমরা নতুন ধরনের একটা উইন্ডোজ ইনস্টল করছি। আপনারা এ ধরনের উইন্ডোজের ব্যাপারে আগ্রহী কিনা?'

'আমরা কোনো উইন্ডো ব্যবহার করি না, যে দুয়েকটা উইন্ডো আছে তা সারা বছর বন্ধই থাকে। কারণ আমাদের সমস্ত অফিসই এসি করা।'

সংশয়যুক্ত গলায় ওপাশের লোকটা বলল, 'না মানে, আপনারা তাহলে কোন সিস্টেমে অপারেট করছেন?'

'অপারেশন? না ভাই, আল্লা আমাকে ভালোই রেখেছে, শরীরের কোনো জায়গায় এখনো অপারেশন করতে হয়নি আমার। চারদিকে অসুখ-বিসুখ বোঝাই, বলতে পারেন তার মাঝেও বেশ সুস্থ আছি আমি।'

কিছুক্ষণ আমতা আমতা করলেন লোকটা। ভাবলেন প্রসঙ্গ পাল্টাবেন, পাল্টালেনও, 'আপনারা তো ইন্টারনেট ব্যবহার করেন, না?'

'এটা একটা কথা বললেন আপনি! নেট ব্যবহার না করে এখন থাকা যায়। দেশে যে হারে মশা হয়েছে, এক সেকেন্ডের জন্য মশারি ব্যবহার না করে ঘুমানো উপায় আছে! শোনেন মশাই, এদেশে মানুষ আর মশা পাল্লা দিয়ে তাদের বংশ বাড়াচ্ছে।' হো হো করে হেসে উঠলেন বদি ভাই, যেন খুব মজার একটা কথা বলেছেন তিনি।

'না, ইয়ে—।' লোকটা বেশ অস্বস্তির স্বরে বললেন, 'আমরা বিদেশ থেকে কিছু নতুন কম্পিউটার চিপস এনেছি।'

'সেটার কোনো দরকার ছিল না কিন্তু। আপনার বিদেশ থেকে এই চিপস সেই চিপস এনে দেশের মিল-কারখানা সব বন্ধ করে দেওয়ার পায়তারা করছেন। আমাদের একটা পটোটো চিপসের কারখানা আছে, বেশ ভালো চলে এটা, বাচ্চারা খুব পছন্দ করে।'

লোকটা একটু থেমে বলল, 'আমরা বরং ডেস্কটপের কথা এখন আর না বলি, ল্যাপটপের কথা বলি।' লোকটা খানিকটা ইতস্তত করে বলল, 'আপনারা কি ল্যাপটপ ব্যবহার করেন?'

'অবশ্যই। দেখলেন না এবার কী শীতটাই না গেল। কাঁথা-কম্বল কী আর সেই শীত মানে! মোটা মোটা লেপ গায়ে দিতে হয়েছে আমাদের। বাসায় প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা লেপ।' বদি ভাই কিছুটা বিরক্তি নিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, এখন রাখি। অফিসে অনেক কাজ, পরে কথা হবে, ওকে?'

ফিক করে এক চিলতে হাসি বের হয়ে এলো আমার মুখ দিয়ে। বদি ভাই আমার দিকে তাকিয়ে বেশ গর্বের সঙ্গে বললেন, 'দেখেছ, কীভাবে সব ট্যাকেল করলাম। একটা অফিসে চাকরি করতে গেলে অনেকে অনেকরকম উটকো ঝামেলা নিয়ে আসবে, অনেক কিছু বিক্রি করতে আসবে, এটা ওটা নিয়ে ফোন করবে, তোমাকে সবকিছু পাশ কেটে যেতে হবে। দেখেছ, আমাদের দেশেই কত ভালো ভালো পটেটো চিপস তৈরি হচ্ছে, আর উনি কি না বিদেশ থেকে চিপস নিয়ে এসেছেন! দেশ নিয়ে এরা একটুও ভাবে না। এই, তুমি এখনো হাসছো কেন?'

আমি কিছু বলার আগেই টেলিফোনটা বেজে উঠল আবার। বদি ভাই আবার আয়েস করে হেলান দিলেন চেয়ারে, মুচকি হাসলেন আমার দিকে তাকিয়ে। আমি বললাম, 'বদি ভাই, ফোন-।'

হাত দিয়ে তিনি আবার আমাকে থামার ইঙ্গিত করলেন। মুচকি হাসিটা আরো একটু বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'নিশ্চয় ওই লোকটাই। কী আর বলবে? এক্সকিউজ মি বলে আরো কিছু কথা বলার চেষ্টা করবে। ওই আগের মতোই প্যানপানানি। ভাল্লাগে না, অফিসে বসে একটু মনোযোগ দিয়ে যে কাজ করব তার কোনো উপায় নেই।'

'তবু ফোনটা রিসিভ করা উচিত আপনার। জরুরী কোনো কথা থাকতে পারে তো ওনার।'

'জরুরী কথা আর কি, নতুন কোনো জিনিস বেচার ফন্দি আর কি!'

কেটে গিয়েছিল ফোনটা, আবার বেজে উঠল। বদি ভাই এবারও রিসিভ করলেন না, এমনকি ফোন যে বাজছে সেটাও পাত্তা দিলেন না। আমার দিকে তাকিয়ে কিছুটা স্টাইল করে বললেন, 'তা চা খাবে, না কফি?'

'একটা হলেই হয়।'

'একটা হলেই হয় মানে কী! চা তো সব সময় খাওয়া হয়, কফি তো সব সময় খাওয়া হয় না, পাওয়াও যায় না। কফি খাও। মোকলেস—।' দরজার দিকে তাকিয়ে অফিসের পিওনকে ডাক দিলেন বদি ভাই, পিওন ঢুকল না, ঢুকলেন অফিসের বড় সাহেব। ঝট করে দাঁড়িয়ে পরলেন বদি ভাই, 'স্যার, আপনি?'

'আপনার টেলিফোনটা কি নষ্ট?'

'না তো!'

'টেলিফোন বাজছিল আপনার, ধরছিলেন না কেন?'

'যতসব আজে-বাজে ফোন আসে তো, তাই ধরি না।'

'ফোন না ধরেই আপনি বুঝতে পারেন-কোনটা আজে-বাজে ফোন আর কোনটা সঠিক ফোন?'

বিগলিত হাসি দিয়ে বদি ভাই বললেন, 'জি স্যার, একটু-আধটু বুঝতে পারি।'

'তাহলে আমার ফোনটা আজে বাজে ছিল!' বড় সাহেব গম্ভীর একটা চাহনি দিয়ে বলেন।

'কিছুক্ষণ আগে যে ফোনটা বাজছিল সেটা আপনার ফোন ছিল, স্যার!' চৈত্রের মাঠের মতো খটখটে গলায় বললেন বদি ভাই।

'আপনি এত বুঝতে পারেন আর ওটা বুঝতে পারেননি! অফিস শেষে আমার সঙ্গে একটু দেখা করবেন, প্লিজ।'

বড় সাহেব চলে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে মোকলেস ঢুকল রুমে। বদি ভাই চায়ের কথাও বললেন না, কফির কথাও না। চাইলেন পানি। পর পর দুই গ্লাস পানি খাওয়ার পর তিনি বিস্বাদমাখা গলায় বললেন, 'রনজু, তুমি একটু বসো, আমি একটু বাথরুম থেকে আসি।'

আমি 'একটু' বসে রইলাম না, বদি ভাইও 'একটু' বাথরুম থেকে এলেন না। ঝাড়া চল্লিশ মিনিট পর তিনি এলেন কোষ্ঠকাঠিন্য চেহারা নিয়ে, তারপর চেয়ারে বসে, নিচু করে ফেললেন মাথা। মোকলেস রুমে ঢুকল আবার। সঙ্গে সঙ্গে বদি ভাই লাফ দিয়ে উঠে বললেন, 'স্লামালাইকুম, স্যার।'

মোকলেস লজ্জামাখা হাসি হেসে বলল, 'আমি না স্যার, বড় স্যার আপনাকে ডাকে।'

মাত্র দেড় মাস সেখানে চাকরি করতে পেরেছিলেন বদি ভাই। তারপর এক সকালে অফিসের মালিক তাকে এক মাসের বেতন অগ্রীম দিয়ে বলেছিলেন, 'বদি সাহেব, কাল থেকে আপনার আর এখানে আসার দরকার নেই।'

বদি ভাই ভেবেছিলেন প্রমোশন হয়েছে তার। এই অফিসের অনেকগুলো শাখা আছে, অন্য কোনো শাখায় ট্রান্সফার করা হয়েছে, বড় স্যার সেখানে যেতে বলেছে তাকে। টাকাটা হাতে নিয়ে বেশ উৎফুল্ল হয়ে তিনি বলেছিলেন, 'তাহলে কোথায় যাব, স্যার?'

'আপনার কোথাও যাওয়ার দরকার নেই। আপনি বাসায় বসে বেশি বেশি সবজি খান আর নিজের বুদ্ধি বাড়ান।'

ব্যাপারটা প্রথমে বুঝতে পারেননি বদি ভাই। অফিস থেকে বাসায় এসে আমাকে বললেন, 'এটা কী হলো, রনজু?'

'কিছু হয় নাই বদি ভাই। আপনি অন্য একটা চাকরি খোঁজার চেষ্টা করেন।' বদি ভাইয়ের প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য তার মুখের দিকে তাকাই আমি।

'তার মানে আমার চাকরি নাই!' চোখ বড় বড় করে বলেন বদি ভাই।

'আপনি এতো দেরিতে বুঝলেন!'

'কিন্তু স্যার যে আমাকে সবজি খেতে বললেন?' আগের চেয়ে বড় হয়ে গেছে বদি ভাইয়ের দু চোখ।

'সবজি খেতে তো অসুবিধা নেই, সবজি খাবেন। সবজি খেলে সত্যি সত্যি বুদ্ধি বাড়ে।'

বেকার হয়ে গেলেন বদি ভাই। সকালে ঘুম থেকে উঠে আমাদের বাসায় আসেন, আমাদের বাসাতেই নাস্তা সারেন। তারপর আমাকে নিয়ে বের হন, যেখানে খুশি সেখানে ঘোরেন আর উদ্ভট উদ্ভট সব কথা বলেন। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে প্রশাব করতে করতে তিনি একদিন বলেন, 'রনজু, রাস্তায় ঘোরাফেরা একটা কুকুর আর রাস্তায় ঘোরাফেরা একটা মানুষের মধ্যে মিল কোথায় জানো?'

ফ্যালফ্যাল করে আমি বদি ভাইয়ের দিকে তাকাই। কী উত্তর দেব বুঝতে পারি না। রাস্তার পাশে কাজটা সেরে তিনি প্যান্টের চেইন লাগাতে লাগাতে ঘুরে দাঁড়ান আমার দিকে। বিজ্ঞের মতো একটা হাসি দিয়ে বলেন, 'এটাই পারলে না! রাস্তায় ঘোরাফেরা কুকুর রাস্তার পাশে ঠ্যাং তুলে প্রশাব করে আর রাস্তায় ঘোরাফেরা করা মানুষ করে প্যান্টের চেইন খুলে। কিছু

বুঝলে?' আমার উত্তর দেওয়ার আগেই বদি ভাই বললেন, 'তার মানে হচ্ছে আমি এখন একটা কুকুর, বলতে বেওয়ারিশ কুকুর।'

'আপনি কুকর হলে আমি কী?'

বদি ভাই হেসে হেসে বলেন, 'তুমি হচ্ছো কুকুরের সঙ্গী!'

কখনো কখনো বদি ভাই বলেন, 'একটা ব্যবসা করলে কেমন হয়, বলো তো রনজু?'

'কীসের ব্যবসা করবেন আপনি?'

'আমার মাথায় অনেক ব্যবসার আইডিয়া আছে। এই যেমন ধরো- অনেকেই তো বাজারে বাজার করতে আসে, বিভিন্ন রকমের সবজি কেনে। সেই সবজি আবার বাসায় নিয়ে গিয়ে কাটতে হয়। বেশ ঝামেলার কাজ এটা। আমরা যদি কাওরান বাজার থেকে কাচা সবজি কিনে তরকারি রান্না করার উপযোগী করে কেটে বিক্রি করি তাহলে কেমন হয়?' খুব উৎসাহ নিয়ে বদি ভাই আমার দিকে তাকান।

'খারাপ হয় না।

'খারাপ হয় না মানে কী! খুবই ভালো হয়। সংসারে যারা রান্না করে তাদের কত ঝামেলা আমরা কমিয়ে দেব জানো? রান্না করা তো কঠিন কিছু না, সব কিছু কেটে সাজিয়ে নেওয়াটাই সবচেয়ে কঠিন। তুমি দেখো, এই ব্যবসায় আমরা লালে লাল হয়ে যাব।'

সপ্তাহ খানেক পরে কাওরান বাজার থেকে আমরা আলু, বেগুন, সিম, পেপে নিয়ে পাঁচ কেজি করে, আর নিয়ে আসি বড় একটা মিষ্টি কুমড়া। বাসায় এসে ওগুলো কাটতে গিয়ে প্রথমে নিজের হাত কেটে ফেললেন বদি ভাই। কোনো রকমে সেই হাতটা ব্যান্ডেজ করে তিনি আবার তরকারি কাটতে শুরু করেন। সাড়ে তিন ঘণ্টায় কাজটা শেষ করে তিনি বলেন, 'পরিশ্রম সৌভাগ্য বয়ে আনে। দেখো, এবার আমার সৌভাগ্য কেউ ঠেকাতে পারবে না।'

পরের দিন বাজারের কোনায় একটা চট বিছিয়ে কাটা তরকারিগুলো সাজিয়ে রাখি আমরা। আধা ঘণ্টা চলে যায় একটা তরকারিও বেচতে পারি না আমরা। যে-ই আমাদের দোকানের সামনে আসে সে-ই মনে করে বাজারের নষ্ট হওয়া তরকারি এগুলো। আমরা টুকিয়ে এনে কেটে বিক্রি করছি।

ঘণ্টা দুয়েক পরে এক মহিলা এসে আমাদের দোকানের সামনে দাঁড়ায়। তিনি অবাক হয়ে তাকায় আমাদের কাটা সবজিগুলোর দিকে। কিন্তু কিছু চাওয়ার আগেই বদি ভাই বলেন, 'আপা, যদি আপনি মাংস রান্না করেন তাহলে কাটা নিয়ে যেতে পারেন; যদি ছোট মাছ কেনেন তাহলে বেগুন-আলু এক সেঙ্গ কিনতে পারেন, বেগুন-আলুর তরকারি খুবই মজার হয়, আমার বউ পুঁটি মাছ আর আলু-বেগুন দিয়ে খুব মজার একটা তরকারি রান্না করতে পারে। আপনি আমার বাসায় এলে খাওয়াব একদিন আপনাকে। তবে গ্যাষ্ট্রিক রোগিদের জন্য পেপের তরকারি খুবই উপকারি, আর ডায়াবেটিকের রোগির জন্য তেমনি অপকারি হচ্ছে মিষ্টি কুমড়া। এবার বলুন তো, আপনাকে কোন তরকারিটা দেব আপা।' বদি ভাই আমার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বলেন, 'রনজু, দাড়ি পাল্লা ঠিক করো।'

মহিলা বদি ভাইয়ের দিকে কিছুটা সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'এগুলো ভিক্ষার তরকারি না?'

'ভিক্ষার তরকারি মানে!'

'এর ওর কাছে চেয়ে এনে কেটে বিক্রি করে যে তরকারি গুলো।'

'এগুলো চেয়ে আনব কেন? নগদ টাকায় কাওরান বাজার থেকে কিনে এনেছি।'

'আমার বিশ্বাস হয় না।' মহিলা মুখ বাঁকা করে বলেন।

মেজাজ খারাপ করে কী একটা বলতে নেয় বদি ভাই। কিন্তু হঠাৎ করে মুডটা পরিবর্তন করে বলেন, 'আমাদের দেখে কী আপনার ফকির মনে হয়?'

'আজকাল কে ফকির কে বড়লোক সেটা বোঝা যায় নাকি! সবার হাতেই আজকাল মোবাইল থাকে, ক্যামেরাওয়ালা মোবাইল। আমার হাতেও আছে।' মোবাইলটা দেখিয়ে বেশ অবজ্ঞার চাহনি দেয় আমাদের সামনে থেকে চলে যান মহিলাটি।

সারাদিন পর মাত্র চার কেজি তরকারি বিক্রি করেছিলাম আমরা, তাও অর্ধেক দামে। বিকেলে গার্মেন্টস থেকে ফিরে যেসব মেয়েরা বাজারে আসে, তাদের কাছে। পুরো আঠার শ লস হয় আমাদের সেদিন।

রাতে ওই কাটা তরকারিগুলো বাড়িতে ফিরিয়ে এনে বদি ভাই তার স্ত্রীকে বললেন, 'নূরজাহান, আজ আর ভাত রান্না করার দরকার নাই, এই তরকারিগুলোই রান্না করো, আগামী চার-পাঁচ দিন আমাদের এই তরকারি খেয়েই থাকতে হবে।'

কথাটা শুনে ভাবী চিৎকার করে উঠে বললেন, ‘এই তরকারি তুমি খাও, তোমার চৌদ্দ গুষ্টি খাউক, তাতে আমার কোনো আপত্তি নাই। কিন্তু আমাকে খাইতে বললেই এই কাটা তরকারি খাওয়া বাদ দিয়া তোমারে কাইট্যা রান্না কইর‍্যা খামু। অকর্মার ঢেঁকি কোথাকার!’

তারপর আর কখনো ব্যবসার নাম মুখে আনেননি বদি ভাই।

সাড়ে তিন মাস আবার বেকার থেকে, এখানে ওখানে বায়োডাটা পাঠিয়ে একটা প্রতিষ্ঠান থেকে ডাক পেয়েছেন বদি ভাই। ইন্টারভ্যু দিতে যাবেন তিনি। কিন্তু তিনি একা যাবে না, আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন। আমি কেন? আমি গেলে নাকি সাহস পান তিনি বুকে।

ছোট খাটো একটা অফিস, তার মধ্যে পর্দা দিয়ে ঘেরা একটা রুম। বাইরে চারটা সোফাসেটের ওপর বেশ কয়েকজন চাকরিপ্রার্থী অপেক্ষা করছে। একজন একজন করে সেই পর্দা ঘেরা রুমে ঢুকছে আর বের হয়ে আসছে ইন্টারভ্যু দিয়ে। সাতজনের পর বদি ভাইয়ের ডাক পরল। উঠে দাঁড়িয়ে পর্দা ঘেরা রুমে রুমে ঢুকলেন তিনি, আমি উঠে গিয়ে রুমটার কাছাকাছি দাঁড়ালাম। যে সোফাসেটের ওপর এতক্ষণ বসেছিলাম সেখান থেকে ইন্টারভ্যুর কিছু কথা শোনা যাচ্ছিল অস্পষ্ট। রুমটার কাছাকাছি দাঁড়াতে এখন স্পষ্ট শোনা যাবে সব কথা। বদি ভাই কী বলে তা শোনার জন্য আমি খুব আগ্রহী হয়ে দাঁড়ালাম রুমটা আরো কাছ ঘেঁষে।

বাইরে থেকে থেকে বোঝা যাচ্ছিল ইন্টারভ্যু নিচ্ছেন মাত্র একজন। তিনি বদি ভাইকে বললেন, ‘আপনাকে খুব বেশি প্রশ্ন করব না, কিন্তু প্রশ্ন যেটাই করি না কেন বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে উত্তর দিতে হবে আপনাকে।’

‘আমি প্রস্তুত, স্যার।’ বদি ভাই উৎফুল্ল গলায় বললেন।

‘ধরা যাক আমরা একটা প্রকল্প হাতে নিলাম। সেই প্রকল্প সুষ্ঠভাবে শেষ করে দিতে এক লোক এক লক্ষ টাকা চাইল। আমরা তাকে না করলাম। দ্বিতীয় আরেকজনকে ডাকলাম, তিনি চাইলেন দুই লক্ষ টাকা। আমরা তাকেও না করলাম। আমার এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ওই প্রজেক্টটা আপনি কত টাকায় শেষ করতে পারবেন?’

কিছুটা ফিসফিস করে বদি ভাই বললেন, ‘একটা প্রশ্ন করব, স্যার?’

‘করুন।’

‘আপনি এ অফিসের কে হন?’

'আমি এ অফিসের ম্যানেজার। আসলে এ ইন্টারভ্যূটা নেওয়ার কথা ছিল এ অফিসের মালিকের। তিনি গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজে ব্যস্ত থাকায় আমাকেই নিতে হচ্ছে এটা।'

'তাহলে ওই প্রজেক্টটা শেষ করতে আমি তিন লাখ টাকা নেব।'

'তিন লাখ টাকা কেন?'

বদি ভাই আগের মতোই ফিসফিস গলায় বললেন, 'স্যার, আপনারও সংসার আছে, আমারও সংসার আছে। এ ধরনের প্রাইভেট ফার্মে কত টাকাইবা বেতন দেয়। আপনি ম্যানেজার মানুষ, আপনি সবকিছু ম্যানেজ করতে পারবেন। সাধারণত এসব ছোট খাটো প্রজেক্টের হিসাব মালিকরা রাখেন না। আমাকে তিন লাখ টাকা দিলে আপনাকে এক লাখ টাকা দেব, আমি এক লাখ টাকা নেব, বাকী এক লাখ টাকা দিয়ে ওই প্রথম জনকে প্রজেক্টটা দিয়ে দেব।'

ম্যানেজার সাহেব চুপ হয়ে রইলেন। সম্ভবত বদি ভাইয়ের প্রস্তাবটা হজম করছেন তিনি। বেশ কিছুক্ষণ পর তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, 'বের হয়ে যান আপনি।'

'আমার প্রস্তাবটা?'

ম্যানেজার সাহেব আগের মতোই গম্ভীর গলায় বললেন, 'আপনাকে বের হয়ে যেতে বলেছি।'

'স্যার, আমাকে একটা কিছু বলেন।'

'আপনি আর এক সেকেন্ড বসে থাকলে গার্ড ডেকে বের করে দেব আপনাকে।' উত্তেজনাপূর্ণ কথা খুব ঠাণ্ডা গলায় বললেন ম্যানেজার সাহেব।

রুম থেকে বের হয়ে এলেন বদি ভাই। আমার কাঁধে একটা হাত রেখে অফিস থেকে বের হয়ে বললেন, 'জীবনের বহু বেকুব দেখেছি, এমন বেকুব আর কখনো আর দেখিনি।'

কিছুই জানি না আমি, এমন ভাব নিয়ে আমি বললাম, 'কার কথা বলছেন, বদি ভাই?'

পাশ কেটে গেলেন বদি ভাই, 'থাক, ওসব আজে বাজে কথা শুনতে হবে না। তোমার পকেটে কিছু টাকা পয়সা আছে নাকি, রনজু?'

'জি, আছে। কী করবেন বদি ভাই?'

'এ চাকরিটা বোধহয় হবে না। মনটা খারাপ হয়ে আছে, এক প্লেট

বিরানী খাব, খাসীর বিরানী, সঙ্গে একটা সেদ্ধ ডিম। শরীরটা গরম করে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াব। তারপর কারো ওপর রাগ হলে পিটিয়ে লম্বা করে ফেলব।' বদি ভাই এক দলা থুতু ফেলেন রাস্তার পাশে।

তারপর আরো নয় জায়গায় ইন্টারভ্যু দেওয়ার পর শেষে ওই ধরাধরি করেই আরেকটা চাকরি হয়ে যায় তার। উনিশ দিনের মাথায় আজ চাকরিটা চলে যায় আবার, তারপর সোজা চলে আসেন আমাদের বাসায়। আমার ঘরে ঢুকে বিছানার ওপর উপুর হয়ে শুয়ে বলেন, 'একটা দুঃসংবাদ আছে, রনজু।'

'কীসের দুসঃবাদ, বদি ভাই?'

'আমার চাকরিটা চলে গেছে।'

'কীভাবে!'

উপুর থেকে চিৎ হয়ে শুয়ে বদি ভাই উদাস হয়ে ছাদের দিকে তাকান। বেশ কিছুক্ষণ সেভাবে তাকিয়ে থেকে বলেন, 'তুমি তো জানো বেশ কয়েকজনের কাছে অল্প-বিস্তর কিছু টাকা পাই আমি। তোমার ভাবীকে একটু ডাক্তার দেখাতে হবে, হাতে টাকা নেই, টাকা দরকার। দুপুরের দিকে অফিসের ফোন থেকে একজনকে ফোন করি। ওপাশ থেকে ফোনটা রিসিভ করতেই বলি, আজকে টাকাটা আপনাকে দিতেই হবে।

ওপাশ থেকে বলে, কীসের টাকা?

মেজাজটা খারাপ ছিল। চিৎকার করে বলি, কীসের টাকা জানেন না?

ওপাশ থেকে আবার বলে, আপনি কে বলছেন?

আগের চেয়ে মেজাজ খারাপ করে বলি, কী অসভ্যের মতো কে কে বলছেন! আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না! টাকা নেওয়ার আগে দুলা ভাই, নেওয়ার পরে শালার ভাই।

আপনি নিজেই তো দেখি একজন অসভ্য!

মেজাজটা এমনি খারাপ ছিল, খারাপের চরম পর্যায়ে চলে গেল সেটা। কষে একটা গালি দিলাম লোকটাকে। সঙ্গে সঙ্গে ওপাশ থেকে বলল, কে বলছেন আপনি?

আমি বললাম, তোর বাপ। তারপর রেখে দিলাম ফোনটা। কিছুক্ষণ পর মনে হলো, আরে! আমি কার সঙ্গে কথা বললাম! আমি তো আমাদের অফিসের মালিকের সঙ্গে কথা বলেছি। ভুল নাম্বার টিপেছিলাম, ওই নাম্বারে চলে গিয়েছিল। মনটা খারাপ হয়ে গেল। ভাবলাম, চাকরিটা চলে যাবে।

তাই দ্রুত স্যারের রুমে গিয়ে কাতর মুখে সব খুলে বললাম। স্যার রেগে গিয়ে বললেন, যে মানুষ টেলিফোনে এভাবে কথা বলে, তাকে আমি আমার অফিসে রাখতে পারব না।'

উত্তেজিত হয়ে আমি বললাম, 'বদি ভাই, তোমার মালিক কি তোমাকে চিনতে পেরেছিল?

চিৎ হওয়া থেকে আমার দিকে কাত হয়ে বদি ভাই বলেন, 'না।'

'তাহলে তুমি তার কাছে ক্ষমা চাইতে গেলে কেন?'

আবার চিৎ হয়ে শুয়ে পরেন বদি ভাই। তাকে এ মুহূর্তে ঠিক বেকুবের মতো লাগছে, সত্যিকারের বেকুব, একেবারে শুয়ে পরা বেকুব, যে বেকুবরা কখনো দাঁড়াতে পারে না, হাঁটতেও পারে না কখনো।

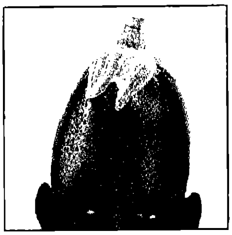

সকাল-দুপুর-বিকেল-প্রতিদিন এখন নিয়ম করে সবজি খান বদি ভাই। সকালে তিনটা রুটি-ডিমের সঙ্গে একটা গাজর, দুপুরে দুই প্লেট ভাত-মাছের সঙ্গে একটা শশা, রাতে খান টমেটো-গাজর-শশার সালাদ, আর কিছু না। তবে ইদানীং অনেকগুলো সবজি দিয়ে একেকটা তরকারি রাধেন ভাবী। আলু-বেগুন-সিম-কপি-মিষ্টি কুমড়া-লাউ-মুলা মোট কথা যখন যা পাওয়া যায় তাই দিয়ে তিনি তরকারি রাধেন। চেষ্টা থাকে যাতে সর্বোচ্চ সংখ্যক তরকারি দিয়ে একেকটা তরকারি রান্না হয়।

সপ্তাহ দুয়েক পরে ভাবী একদিন বদি ভাইকে বলেন, 'আগে রাজার ভান্ডার শেষ হয়ে যেত বসে খেতে খেতে, তোমার ভান্ডার তো শেষ হয়ে যাচ্ছে সবজি খেতে খেতে।'

বদি ভাই নির্ভার ভঙ্গিতে বলেন, 'অসুবিধা নাই। বুদ্ধি বাড়লে অনেক কিছু করা যায়, বুদ্ধি থাকলে অনেক কিছু হয়।'

'কিন্তু এতদিন হয়ে গেল তোমার বুদ্ধি বাড়ার তো কোনো লক্ষণ দেখছি না।' মুখ টিপে হাসতে হাসতে বলেন ভাবী।

'বুদ্ধি কমেরইবা তুমি কী দেখলে?'

'অনেক কিছুই তো দেখা যায়।'

'যেমন?' চোখ-মুখ টান টান করে সিরিয়াস ভঙ্গিতে বলেন বদি ভাই।

'সেটা এখন বলা যাবে না, সুযোগ মতো একসময় তোমাকে বলব।'

মনটা খারাপ হয়ে যায় বদি ভাইয়ের। আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, 'দেখলে, যার জন্য করি চুরি সেই বলে চোর। আমার কী কোনো কিছুর অভাব আছে। বাপ যা রেখে গেছে তা বসে বসে খেলেও শেষ হবে না। কোনো ভাই-বোন নেই আমার, আছে কেবল একটা মা, তাও অন্ধ। কোথায় যায় টায় না, সারাক্ষণ ঘরের মধ্যে বসে থাকে আর পান চিবায়। ভেবেছিলাম, বেকার

বসে থাকলে নানাজন নানা কথা বলবে, একটু বুদ্ধি বাড়িয়ে কিছু একটা করব, সেখানেও ফ্যাকরা। চলো তো, আজ বাসায়ই থাকব না। সারাদিন বাইরে বাইরে ঘুরব। আজ দুপুরে আমি তোমাকে খাওয়াব।'

রাগ করে বাসা থেকে বের হয়ে আসেন বদি ভাই। কিছুদূর এসে একটা বাদামওয়ালাকে দেখে দু টাকার বাদাম কিনে বলেন, 'একটা কিছু করা দরকার, রনজু। সবাই কিছু না কিছু করে। এই যেমন ধরো এই ছেলেটাও বাদাম বেচে সারাদিন। কিছু একটা না করলে নিজেকে ঠিক মানুষ মনে হয় না। মনে হয় রাস্তায় ছেড়ে দেওয়া ছাগল। সারাদিন এটা ওটা মুখে দাও, চাবাও, আর যেখানে খুশি সেখানে ঘুরে বেড়াও।'

'ব্যাপারটা আমিও ভাবছি। আমারও তো লেখাপড়া শেষ হয়ে এলো, আমারও কিছু একটা করতে হবে। এখন থেকেই চেষ্টা না করলে পরে কিছু করতে পারব না, বদি ভাই।'

'একটা বুদ্ধি বের করো না, যাতে দুজন মিলে কিছু একটা করতে পারি। সেটা যত ছোট করেই হোক, শুরু করা দরকার আগে।' বদি ভাই কাতরমাখা গলায় বলেন।

'আমি ভাবতে শুরু করেছি। একটা কিছু বের হয়ে আসবেই।'

হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর চলে এসেছি আমরা। মেইন রোডের পাশে একটা মোটর সাইকেল থামিয়ে একজন ট্রাফিক সার্জেন্ট দাঁড়িয়ে আছেন। তার আশেপাশে বেশ কয়েকটা গাড়ি থামানো। ট্রাফিক সার্জেন্ট সার্জেন্ট একে একে সকলের কাগজপত্র পরীক্ষা করছেন।

বদি ভাই আমাকে নিয়ে আস্তে এগিয়ে গেলেন সেদিকে। কাছে গিয়েই দেখতে পেলেন-বাইশ তেইশ বছরের একটা ছেলে রাস্তার এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে, চোখ দুটো কেমন যেন ভেজা ওর। ট্রাফিক সার্জেন্ট অন্যান্যদের কাগজপত্র দেখছেন, যাদের পাচ্ছেন তাদের ছেড়ে দিচ্ছেন, যাদের পাচ্ছেন না তাদের জরিমানা করছেন। ভীষন ব্যস্ত তিনি। একেকজনের কাগজ পরীক্ষা করার জন্য তিনি বেশ সময় নিচ্ছেন।

ছেলেটার দিকে এগিয়ে গেলেন বদি ভাই। তারপর ইশারা করে একটু দূরে সরিয়ে এনে বললেন, 'ছোট ভাই, কী হয়েছে তোমার?'

চোখ দুটো টলটল করছে ছেলেটির। কোনোরকমে চোখের পানি আটকিয়ে সে বলল, 'নতুন চাকরি নিয়েছি।'

'ড্রাইভারের চাকরি?'

'জি।'

'কয়দিন হলো নিয়েছ?'

'তিনদিন।'

'আগে কোথায় চাকরি করতে?'

'বনানীর এক মালিকের চাকরি করতাম। বিদেশে চলে গেছেন তারা।'

'সমস্যা কী তোমার?'

'সমস্যা তেমন কিছু না। একটু দ্রুত গতিতে গাড়ি চালাচ্ছিলাম তো তাই আমাকে আটকিয়েছে। সম্ভবত জরিমানা করবে আমাকে। কিন্তু আমার কাছে কোনো টাকা নাই। মালিক যদি জানতে পারে আমি জোরে গাড়ি চালিয়েছি তাহলে চাকরিটা থাকবে না। আমার মালিকটা খুব রাগী মানুষ।'

খুব সরল মনে হলো ছেলেটাকে। খারাপ লাগছে। আমাদের কাছেও তেমন কোনো টাকা-পয়সা নেই যে সাহায্য করব তাকে। বদি ভাই মাথা নিচু করে কী যেন ভাবতে লাগলে। বেশ কিছুক্ষণ পর তিনি ছেলেটাকে বললেন, 'কয়েকটা কথা বলি তোমাকে, মনোযোগ দিয়ে শোনো, কাজে লাগবে।'

বিশ বাইশ মিনিট পর ট্রাফিক সার্জেন্ট ছেলেটাকে ডাকলেন। সবার কাগজপত্র পরীক্ষা করে ছেড়ে দিয়েছেন তিনি। ছেলেটা কিছুটা কাঁপা কাঁপা পায়ে এগিয়ে গেল সামনের দিকে। আরো কিছু গাড়ি আটকানোর উদ্দেশ্যে পাশের রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছেলেটার দিকে হাত বাড়ালেন ট্রাফিক সার্জেন্ট। ছেলেটা বলল, 'কী দেব, স্যার।'

গম্ভীর গলায় ট্রাফিক সার্জেন্ট বললেন, 'জানিস না কী দিবি, তোর ড্রাইভিং লাইসেন্সটা দেখা।'

চেহারা বিষন্ন করে ফেলল ছেলেটা। ভয়ে ঘন ঘন ঢোক গিলছে সে। ট্রাফিক সার্জেন্ট রাস্তার দিকেই তাকিয়ে আছে। মনে হচ্ছে-আরো কিছু গাড়ি আটকানো দরকার, নাহলে আজকের খরচটা উঠবে না তার। সেদিকে তাকিয়েই তিনি বললেন, 'কীরে, লাইসেন্সটা দেখা।'

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল ছেলেটা। লাইসেন্স দেখানোর কোনো তাড়া নেই তার। তাকে দেখে মনে হচ্ছে ট্রাফিক সার্জেন্টের সঙ্গে গল্প করছে সে।

ঘুরে দাঁড়ালেন ট্রাফিক সার্জেন্ট, ‘এই ব্যাটা, কথা কানে যায় না! লাইসেন্স দেখাতে বলেছি না তোকে!’

চেহারাটা আগের চেয়ে বিষন্ন করে ছেলেটা বলে, ‘স্যার, আমাকে মাফ করে দেন।’

ট্রাফিক সার্জেন্ট খ্যাকখ্যাক করে উঠে বলে, ‘কীসের মাফ! লাইসেন্স দেখা। তাড়াতাড়ি কর, আরো গাড়ি ধরতে হবে।’

‘আমি আবারো মাফ চাই, স্যার। আমার লাইসেন্সটার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে।’

‘তো!’ কিছুটা রেগে যান ট্রাফিক সার্জেন্ট।

‘বাসায় রেখে এসেছি সেটা।’

‘ওটা তো বাসায় রেখে আসার জিনিস না। গাড়ি নিয়ে তুমি রাস্তায় বের হবে আর লাইসেন্স রেখে আসবে বাসায়, সেটা তো হবে না।’ ট্রাফিক সার্জেন্ট প্রচন্ড রুক্ষ গলায় বলেন, ‘রেজিস্ট্রেশনের কাগজপত্র দেখা।’

‘রেজিস্ট্রেশনের কাগজপত্র—।’ মাথা চুলকাতে চুলকাতে ছেলেটা বলল, ‘ওগুলো সম্ভবত গ্লোভ কম্পার্টমেন্টে আছে।’

‘বের করো।’

‘তবে একটা কথা।’

‘আবার কী কথা?’ ধমকে ওঠেন পুলিশ সার্জেন্ট।

‘ওইসব কাগজপত্রের সঙ্গে আমার নাম-ধাম কিছু মিলবে না।’

‘কেন!’ আগের চেয়ে ধমকে ওঠেন পুলিশ সার্জেন্ট।

‘একটা কারণ আছে।’

পুলিশ সার্জেন্ট আস্তে আস্তে আরো ক্ষেপে যাচ্ছেন। তিনি ছেলেটার দিকে একটু ঝুকে দাঁড়িয়ে খুব ঠান্ডা গলায় বললেন, ‘কারণটা বল।’

‘এই গাড়িটা আমি একটু আগে হাইজ্যাক করেছি।’

‘হাইজ্যাক!’

‘জি, এরজন্য গাড়ির মালিককে খুন করতে হয়েছে।’

‘খুনও করেছিস তুই!’ উত্তেজনায় কাঁপতে থাকেন পুলিশ সার্জেন্ট, ‘লাশ কোথায় রেখেছিস?’

‘গাড়ির পেছনের ট্যাংকের ভেতর।’

‘ও মাই গড!’ পুলিশ সার্জেন্টের চোখ বড় বড় হয়ে গেছে। তিনি

কাঁপছেন। কাঁপতে কাঁপতেই ছেলেটার কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কী দিয়ে খুন করেছিস গাড়ির মালিককে?'

'পিস্তল দিয়ে।'

'পিস্তলটা কই?'

'পিস্তলটাও ওই গ্লোভ কম্পার্টমেন্টেই আছে।'

নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলেন না পুলিশ সার্জেন্ট। চেহারা কেমন যেন ফ্যাকাসে হয়ে গেল তার। দ্রুত নিজের পকেট থেকে পিস্তলটা বের করে ছেলেটাকে বললেন, 'হাত দুটো উঁচু করে দাঁড়া, একটুও নড়ার চেষ্টা করবি না, করলেই গুলি করা হবে তোকে।'

হাত দুটো উঁচু করে দাঁড়াল ছেলেটি। আশপাশে মানুষজন জড়ো হয়ে গেছে অনেক। সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে। সবার কৌতূহল এখন তাকে ঘিরে।

পুলিশ সার্জেন্ট মোবাইল বের করে নিকটতম থানার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। খুব দ্রুত দু গাড়ি পুলিশ নিয়ে উপস্থিত হলো ঘটনাস্থলে। থানার সবচেয়ে বড় অফিসার নিজেই এসেছেন ঘটনার তদন্ত করতে।

গাড়ি থেকে সব পুলিশ নেমে ঘিরে ফেলল ছেলেটাকে। একটু পর বড় অফিসারও নামলেন গম্ভীর মুখে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ সার্জেন্ট পুরো ঘটনা খুলে বললেন তাকে। বড় অফিসার সব কথা শুনে বড় বড় করে ফেললেন চোখ দুটো।

এখনো হাত উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে ছেলেটি। বড় অফিসার কিছুটা আতঙ্কভাব নিয়ে এগিয়ে গেলেন ছেলেটার সামনে। তারপর খুব ঠান্ডা গলায় বললেন, 'তুমি কি সত্যি তোমার লাইসেন্সটা বাসায় রেখে এসেছ?'

'না তো।'

'কোথায় আছে তাহলে?'

'আমার প্যান্টের পকেটে।'

'দেখাও তো।'

হাত নামিয়ে ছেলেটা প্যান্টের পকেট থেকে লাইসেন্সটা বের করে বড় অফিসারের হাতে দিল। বড় অফিসার সেটা নেড়ে চেড়ে দেখলেন কোনো

অসুবিধা নেই লাইসন্সটার, মেয়াদ তো শেষ হয়ে যায়ইনি, নাম-ধামও ঠিক আছে। একেবারে নিখুঁত আছে লাইসেন্সটা।

বড় অফিসার লাইসেন্সটা ছেলেটার হাতে ফেরত দিয়ে বললেন, 'তোমার গাড়ির কাগজপত্র দেখাও তো।'

গাড়ির গ্লোভ কম্পার্টমেন্ট থেকে সব কাগজপত্র বের করে বড় অফিসারের হাতে দিল ছেলেটি। সবগুলো কাগজ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে তিনি বললেন, 'না, কোনো সমস্যা তো দেখছি না। এই কাগজপত্রও তো ঠিক আছে। কোনো প্রবলেম নেই।' বড় অফিসার এই কাগজগুলোও ফেরত দিয়ে বললেন, 'শুনলাম তোমার গাড়ির ট্যাংকে নাকি কার লাশ পড়ে আছে, খোলো ওটা।' গাড়ির ট্যাংকির দিকে এগিয়ে গেলেন বড় অফিসার।

ছেলেটাও এগিয়ে গেল গাড়ির ট্যাংকিটার দিকে। খুলে ফেলল সেটা। কিন্তু সেখানে গাড়ির স্পেয়ার টায়ার আর কয়েকটা যন্ত্রপাতি ছাড়া কিছুই চোখে পরল না কারো। বড় অফিসার কপাল কুঁচকে বললেন, 'তোমার পিস্তলটাওতো বোধ হয় নেই তাহলে। কিন্তু পুলিশ সার্জেন্ট তোমার সমন্ধে এসব কথা বললেন কেন?'

ছেলেটি এবার কিছুটা চিৎকার করে বলল, 'মনে হচ্ছে উনি একজন মহা মিথ্যাবাদী। আমার তো মনে হয় উনি এখন আরেকটা মিথ্যা কথা বলবেন যে, আমি খুব দ্রুত গতিতে গাড়ি চালাচ্ছিলাম, আমাকে এখন জরিমানা করা উচিত।'

বড় অফিসার একটু পিছিয়ে এসে পুলিশ সার্জেন্টের সামনে এসে দাঁড়ালেন। মাথা নিচু করে ফেলেছেন তিনি। কোনো কথা বললেন না আর বড় অফিসার। ইশারা করে ছেলেটাকে চলে যেতে বললেন তিনি।

ছেলেটা এগিয়ে এলো আমাদের দিকে। বদি ভাইকে ইশারা করল গাড়িতে চরার জন্য। আমি আর বদি ভাই গাড়িতে চরলাম। বেশ কিছুদূর চালিয়ে আসার পর ছেলেটা রাস্তার পাশে গাড়ি থামাল। গাড়ি থেকে ও নামতেই আমরাও নামলাম। ছেলেটা দ্রুত বদি ভাইয়ের একটা হাত চেপে ধরে বলল, 'আপনার বুদ্ধিতে বড় একটা সমস্যা থেকে আজ বেঁচে গেলাম আমি। মানুষের অনেক বুদ্ধির কথা শুনেছি আমি, কিন্তু আপনার মতো বুদ্ধি

কারো দেখিনি। আমি আপনার কাছে চিরজীবন কৃতজ্ঞ থাকব।' ছল ছল করছে ছেলেটার চোখ দুটো। একটু পর সে চলে গেল।

বদি ভাই আর আমি আবার রাস্তা দিয়ে হাঁটছি। হাঁটতে হাঁটতে তিনি হঠাৎ চিৎকার করে উঠে বলেন, 'রনজু, মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে!'

খুব আগ্রহ নিয়ে আমি বলি, 'কী বুদ্ধি, বদি ভাই?'

বুদ্ধিমানের মতো হাসতে থাকেন বদি ভাই, কিন্তু কিছু বলেন না। কেবল মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে হঠাৎ বলে ফেলেন, 'সবজি খেলে আসলেই বুদ্ধি বাড়ে, রনজু। অনেক ব্যবসাই তো করতে চাইলাম, কিন্তু হলো আর কই! কাল থেকে অন্য একটা ব্যবসা করব আমি, বুদ্ধির ব্যবসা। আমি ম্যানেজার, তুমি অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার! দেখি, এবার আমাদের ঠেকায় কে!'

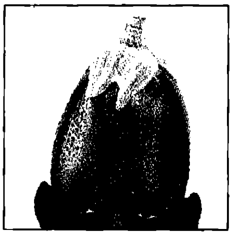

আল্লার নাম নিয়ে ব্যবসাটা শুরু করে দিলাম আমরা। বদি ভাইয়ের বাসার সামনের দিকে অনেকগুলো আধাপাকা ঘর উঠানো আছে। অনেকদিন ধরে খালি পরে আছে সেগুলো, ভাড়া নেয় না কেউ। তারই একটা ঘর ভাড়া নিয়েছি আমরা। খুবই কম ভাড়া। রাতেই কথা বলে রেখেছিলাম ঘরের মালিকের সঙ্গে। সকাল থেকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে কাজ প্রায় শেষ করে ফেলেছি। বদি ভাইয়ের বাসা থেকে ডায়নিং সেটের ছয়টা চেয়ারই আনা হয়েছে আর আমাদের বাসা থেকে নেওয়া হয়েছে একটা টেবিল। আরো একটা টেবিল দরকার, ব্যবসা একটু জমে উঠলেই কেনা হবে টেবিলটা।

বিকেলে মিলাদ পরানো হবে। একটা হুজুরকে বলা হয়েছে। হুজুর চেয়েছেন দেড়শ টাকা, তবে দুই শ টাকা পেলে খাস দিলে দোয়া করবেন তিনি। নতুন ব্যবসা, দুই শ টাকাতেই রাজী হয়েছি আমরা। আশপাশের মুরব্বী এবং পরিচিতি লোকদেরও দাওয়াত দেওয়া হয়েছে।

দুপুরের দিকে সাইনবোর্ড এসে গেল। বদি ভাই মোটা তার এনে বাধতে লাগলেন সাইনবোর্ডটা। কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব এসেছে আমাদের, বেশ উৎসাহ নিয়ে সাহায্য করছে ওরাও।

মোটামুটি বিকেলের আগেই সব কাজ শেষ হয়ে গেল আমাদের। আমরাও হাত-মুখ ধুয়ে রেডি হয়ে আছি। এখন হুজুর আসলেই মিলাদ শেষ করে অফিসটা উদ্বোধন করব আমরা। অবশ্য উদ্বোধনের জন্য কেউ ফিতা কাটবে না আমাদের, মিলাদ শেষ হলে এমনি এমনি উদ্বোধন হয়ে যাবে অফিসটা।

বিকেলের নামাজ শেষ করেই হুজুর চলে এলেন। আমাদের সাইনবোর্ডের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'অ, আপনাদের দোকানের নাম মুশকিল আসান সেন্টার।'

'হুজুর, এটা দোকান না, অফিস।' বদি ভাই হাত কচলিয়ে গদ গদ হয়ে বললেন।

'ওই হলো। দোকানও যা, অফিসও তা। কিন্তু সাইনবোর্ড দেখে তো মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল।'

'কেন হুজুর!' শঙ্কিত গলায় বললেন বদি ভাই।

'মুশকিল আসান করার মালিক তো আল্লা, সেখানে আপনারা কী মুশকিল আসান করবেন? খোদার ওপর খোদগারি করা হয় কিনা!' হুজুর ফতোয়া দেয়ার মতো দাঁত কিড়মিড় করে বলেন।

'এটা আপনি কী বলছেন হুজুর! আল্লা নিজে তো মুশকিল আসান করেন না, মানুষের মাধ্যমেই করান।'

'নাউজুবিল্লাহ। আল্লাপাক এ দুনিয়াটা নিজ হাতে তৈরি করেছেন, আর আপনি বলছেন সেই তিনি কিনা নিজে মুশকিল আসান করেন না!'

'হুজুর, আপনি কিন্তু একটা ভুল কথা বললেন।'

'কী ভুল বললাম?'

'আল্লাপাক তো নিরাকার। আপনি তার হাত পেলেন কোথায়?'

'কোথায় আমি হাতের কথা বললাম!'

'আপনি বললেন না-আল্লাপাক এ দুনিয়াটা নিজ হাতে তৈরি করেছেন।' বদি ভাই খুব সিরিয়াস ভঙ্গিতে বললেন।

'আপনি তো দেখি ত্যান্দর টাইপের মানুষ। যান, আপনার দোকানের মিলাদ আমি পড়াব না। আপনি অন্য কাউকে খোঁজেন।' হুজুর হন হন করে হেঁটে যান। আমি দৌড়ে গিয়ে হুজুরের একটা হাত চেপে ধরে বলি, 'হুজুর, নতুন অফিস উদ্বোধন করব, আপনি এভাবে চলে গেলে আমাদের জন্য ব্যাপারটা ভালো হবে না।'

'ভালো না হলে আমি কী করব?'

'মিলাদটা পরিয়ে যান আপনি।'

'বললাম তো অন্য কাউকে দিয়ে পরান।'

পুরো দশ মিনিট হুজুরকে তৈল মর্দন করলাম, শুধু পা ধরা বাকী। কোনো কিছুতেই কোনো কিছু হয় না। মুশকিল আসানের অফিস খুলতে গিয়ে প্রথমে আমরাই মুশকিলে পরলাম! মাথায় কিচ্ছু আসছে না। হুজুর

হেঁটে যাচ্ছেন, পেছন পেছন আমিও হেঁটে যাচ্ছি। হঠাৎ হুজুরকে বললাম, 'হুজুর, আরো একশ টাকা বাড়িয়ে দেই?'

'কীসের টাকা?'

'ওই যে মিলাদ পরানোর টাকা।'

'আপনি আমাকে বাজারের মুরগি পেয়েছেন, দরাদরি শুরু করেছেন?'

অবশেষে মুরগির মতো দরাদরি করেই চারশ টাকায় রাজি করিয়ে ফেলি হুজুরকে। সন্ধ্যার আগেই আমাদের অফিসের উদ্বোধন শেষ হয়ে গেল। হুজুর যাওয়ার সময় বললেন, 'কিছু মনে করবেন না, আমার মাথাটা একটু গরম তো।'

বদি ভাই আর আমি আমাদের মুশকিল আসান সেন্টারে বসে আছি। সামনে দিয়ে যেই যাচ্ছে একবার করে হলেও তাকাচ্ছে আমাদের দিকে। কিন্তু রাত নয়টা বেজে গেল কোনো ক্লায়েন্ট পেলাম না আমরা। বদি ভাই বললেন, 'হতাশ হইও না। নতুন অফিস তো, অনেকেই তো আমাদের কথা জানে না।'

'আমার মনে হয় মানুষের সমস্যা-টমস্যা সব কমে গেছে।'

'এটা তোমার ভুল ধারনা। দিন যত যাচ্ছে, মানুষের সমস্যা তত বাড়ছে। মানুষের যে কত রকমের সমস্যা আছে তা তুমি জানো না। এখানে বসেছ, এখন দেখবে সমস্যা কত প্রকার ও কি কি?'

'কই, এখন পর্যন্ত তো কেউ কোনো সমস্যা নিয়ে আসল না।'

'এত অধৈর্য্য হয়ো না তো। শোনো, আমাদের গ্রামে একটা লোক ছিল, মহেশ মুন্সী নাম। লোকটার সমস্যা ছিল কি জানো?'

'কি?'

'কোনো মাছ খেতে পারতেন না তিনি। তার মনে হতো, মাছ খেলেই মাছের কাঁটা গলায় বিধবে তার অথবা কোনো রকমে কাটা যদি পেটে ঢুকে যায় তাহলে সেটা হজম হবে না, বাথরুমে অসুবিধা হবে তার। এটা মনে করে তিনি মাছই খেতেন না। কী বুঝলে?'

'হ্যাঁ, এটাও একটা সমস্যা।'

'তোমাকে আরেকটা সমস্যার কথা বলি। এক লোক প্রতিদিন থু থু করে

ঘুম থেকে উঠতেন। তার মনে হতো—তার মুখের ভেতর কেউ পেশাব করে দিয়েছে।'

'সত্যি সত্যি কেউ প্রশাব করত নাকি?'

'না। কিন্তু তার মুখ দিয়ে পেশাবের গন্ধ বের হতো। সবাই তো ভেবে পায় না কে তার মুখে প্রশাব করে দেয়। এদিকে এভাবে থু থু করতে করতে পাগল হওয়ার যোগার লোকটার। একদিন সে সত্যি সত্যি পাগল হয়ে যায়।'

'মারাত্মক সমস্যা দেখি।'

'ঘটনা শেষ হয়নি। লোকটার পরিবার উদ্বিগ্ন হয়ে গেল তাকে নিয়ে। এরকম কেন হচ্ছে? তারা একদিন একটা বুদ্ধি বের করল। লোকটার ঘরে মিজান নামে একজনকে পাঠিয়ে দিল, লুকিয়ে রইল সে খাটের নিচে। রাতে লোকটা ঘরে ঢুকল, এটা ওটা করে ঘুমানোর জন্য বাতি নিভিয়ে দিল।

বেশ কিছুক্ষণ পর লোকটা ঘড়ঘড় শব্দ করতে থাকে। বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ায় সে। মেঝেতে নেমে সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে বলে, না, আমি খাব না; না, আমি খাব না। লোকটা এরকম করে আর দৌড়াদৌড়ি করে ঘরের ভেতর। হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে পরে পেশাব করা শুরু করে এবং সেই পেশাব হাতে নিয়ে মুখে দিতে থাকে। একটু পর পেশাব করা শেষ হলে বিছানায় এসে আবার আগের মতো ঘুমিয়ে পরে। সকালে ঘুম থেকে ওঠে থু থু করতো।'

'এরকম করার কারণ কী?'

'প্রথমে কেউ কোনো কারণ খুঁজে পায়নি। শেষে তাকে এক সাইকিয়াটিস্টের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর জানা যায়-কয়েক মাস আগে কয়েকজন সন্ত্রাসী ধরেছিল তাকে। কিন্তু তার কাছে তেমন কিছু না পেয়ে রাগ হয় তাদের। শেষে তারা তাকে পেশাব করে নিজের পেশাব খেতে বলে। প্রাণের ভয়ে সেটাই করে সে। কিন্তু এ ব্যাপারটা মনের ভেতর গেঁথে যায় তার। প্রতি রাতে ঘুমালেই সে ওই ব্যাপারটা স্বপ্নে দেখে এবং ওই কাজটা সত্যি সত্যি করে ফেলে।' বদি ভাই আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলে, 'এটাও কিন্তু একটা সমস্যা।'

'অনেক বড় সমস্যা।'

আরেকটা সমস্যার কথা বলতে যাচ্ছিলেন বদি ভাই, তার আগেই একটা

লোক ঢোকে আমাদের অফিসে। হেলান দিয়ে বসে ছিলাম আমরা, সোজা হয়ে বসি। বদি ভাই খুব স্বাভাবিকভাবে বলেন, 'বসুন।'

টেবিলের পাশে একটা চেয়ারে বসেন লোকটি। তারপর বেশ ইতস্তত ভঙ্গিতে বলেন, 'আপনারা কি সব মুশকিলের সমাধান দেন?'

বদি একটু গম্ভীর হয়ে বলেন, 'চেষ্টা করি।'

'আপনাদের রেট কত?'

'সেটা নির্ভর করে কার মুশকিল কত জটিল।' বদি ভাই খুক করে একটু কেশে বলেন, 'আপনার কোনো সমস্যা আছে নাকি?'

'জি।'

'আপনি যেহেতু আমাদের প্রথম ক্লায়েন্ট সেহেতু রেট যাই হোক ২৫% কম নেওয়া হবে আপনার কাছ থেকে।'

'টাকাটা কি অগ্রীম দিতে হবে।'

'জি।'

'যদি আপনাদের পরামর্শে কোনো কাজ না হয়?'

'তাহলে সব টাকা ফেরত পাবেন আপনি।'

বেশ কিছুক্ষণ চুপ হয়ে বসে থাকেন লোকটি। কী যেন ভেবে শেষে বলেন, 'আমার সমস্যাটা কি বলা শুরু করব।'

'আপনি তো নিশ্চয় লেখাপড়া জানেন?'

'জি, আমি ডিগ্রী কমপ্লিট করেছি।'

বদি ভাই আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, 'ওনাকে তুমি খাতা আর কলমটা দাও, উনি ওনার সমস্যা খাতায় লিখুক। তারপর আমি ওটা দেখে সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করব। তার আগে বলুন, আপনার নাম কি?'

'রোকন।'

'পুরো নাম বলুন?'

'রোকনুজ্জামান খান।'

রোকন সাহেবকে আমি খাতা আর কলম এগিয়ে দিলাম। তিনি তার সমস্যা লিখতে লাগলেন। পনের মিনিটের মধ্যে তিনি তার সমস্যা লিখে খাতা আর কলমটা ফেরত দিলেন আমার কাছে। আমি এক পলক দেখে বদি ভাইয়ের হাতে দিলাম সেটা। খুব মনোযোগ দিয়ে সমস্যাটা পড়তে লাগলেন তিনি। প্রায় আধা ঘণ্টা পর মুখটা হাসি হাসি হয়ে গেল তার।

মাত্র পাঁচ মিনিটে সমস্যার সমাধান বলে দিলেন বদি ভাই। রোকন সাহেব প্রথমে একটু দ্বিধা-দ্বন্ধের মধ্যে ছিলেন, একটু পর তার মুখটাও হাসি হাসি হয়ে গেল। বদি ভাই বললেন, 'আমার কথা অনুযায়ী আজকেই যদি কাজটা করেন, তাহলে আজই ফলটা পেয়ে যাবেন। তবে রেজাল্ট যাই হোক, কালকে এসে জানাবেন কিন্তু।'

পরের দিন অফিস খোলার সঙ্গে সঙ্গে হাসি হাসি চেহারা করে আমাদের অফিসে এসে হাজির রোকন সাহেব। বদি ভাই বললেন, 'কেমন আছেন?'

রোকন সাহেব হাসির মাত্রাটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'ভালো।'

'ভালো তো হওয়ারই কথা, আপনার খারাপ হোক এমন কিছু তো বলিনি আমি।' বদি ভাই আয়েস করে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে বলেন, 'এবার বলুন তো আপনি কীভাবে কাজটা করেছেন?'

'আপনার কথা অনুযায়ী আমার মোবাইলে মেসেজটা লিখলাম।'

'কী লিখেছেন সেটা বলুন।'

'লিখলাম-প্রিয় নিয়াজ, দশ হাজার টাকা হবে তোর কাছে? আমার জন্য না, আমার বন্ধু মনিরের জন্য। ওর নাকি খুব দরকার টাকাটা। কিন্তু আমার কাছে এ মুহূর্তে কোনো টাকা নেই। লজ্জায় তো আমি মরে যাচ্ছি, কীভাবে ওকে না বলি। তাই তুই যদি টাকাটা দিস তাহলে ওই টাকাটা ওকে দিয়ে দিতাম। তারপর ও আমাকে ফিরিয়ে দিলে আমি তোকে ফিরিয়ে দিতাম। প্লিজ, টাকাটা দেওয়ার চেষ্টা কর, তা না হলে মনিরের কাছে মুখ দেখাতে পারব না।'

'গুড। মেসেজটা লিখেছেন নিয়াজের কাছে, কিন্তু পাঠিয়ে দিয়েছেন মনিরের মোবাইলে।'

'জি।'

'তারপর?'

'আজ সকালে মনির এসে হাজির। আমার হাত ধরে বলে, তোর কাছে টাকা নেই সেটা আমাকে বলবি না! আমার জন্য তোর বন্ধু নিয়াজের কাছে টাকা ধার চেয়েছিস তুই! আমি বললাম, আমি নিয়াজের কাছে টাকা চেয়েছি এটা তুই জানলি কী করে? মনির তখন ওর মোবাইলে পাঠানো মেসেজটা

দেখিয়ে বলল, এটা বোধ হয় তোর বন্ধু নিয়াজের কাছে পাঠানোর কথা ছিল, ভুল করে আমার মোবাইলে পাঠিয়েছিস। ভাগ্যিস ভুলটা করেছিলি, না হলে জানতেই পারতাম না তোর কাছে এ মুহূর্তে কোনো টাকা নেই। আমার জন্য তোর টাকা ধার করতে হবে না, আমি অন্য জায়গায় ম্যানেজ করার চেষ্টা করব।'

'তারপর মনির চলে গেল, না?'

'জি।'

'আসলে কিছু কিছু মানুষ আছে যারা টাকা ধার চাইলে না করা যায় না। নিজের কাছে না থাকলেও অন্যের কাছ থেকে ধার করে এনে দিতে হয়। খুবই অস্বস্তিকর একটা ব্যাপার।' বদি ভাই উঠে দাঁড়ান । সঙ্গে সঙ্গে রোকন সাহেবও উঠে দাঁড়ান। হ্যান্ডশেক করতে করতে তিনি বলেন, 'আগামীতে নতুন কোনো পরামর্শের জন্য দরকার হলে আবার আসব আমি।'

রোকন সাহেবের হাত ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বদি ভাই বললেন, 'ওয়েলকাম, মোষ্ট ওয়েলকাম।'

বদি ভাই আমার পিঠে একটা থাপ্পর দিয়ে বললেন, 'যাও, সুব্রত মিষ্টান্ন ভাণ্ডার থেকে বড় বড় দুটো মিষ্টি আর দুটো সমুচা নিয়ে আসো। আমাদের প্রথম সাফল্যটা আমরা একটু সেলিব্রেট করি।'

'মিষ্টি কি কেবল আমরা দুজনই খাব?'

'আর কে খাবে?'

'বাসায় ভাবী আছে না, খালাম্মাও তো আছে।'

'মার তো ডায়াবেটিক, তোমার ভাবী অবশ্য মিষ্টি খুব পছন্দ করে।'

'ডায়াবেটিকদের জন্যও আজকাল মিষ্টি পাওয়া যায়। রাতে বাসায় যাওয়ার সময় মিষ্টি কিনে নিয়ে যেতে হবে। খালাম্মা চোখে দেখেন না, কিন্তু আপনি বাউণ্ডুলের মতো ঘোরাফেরা বাদ দিয়ে ব্যবসা করবেন বলে কত দোয়া করলেন, কত কাকুতি মিনতি করলেন আল্লার কাছে।'

'ঠিক আছে, তুমি যখন বলছো নিয়ে যাব।' বদি ভাই একটু থেমে বলেন, 'একটা কথা বলি তোমাকে।'

'বলেন।'

'কথাটা কাউকে বলতে পারবে না কিন্তু।'

'না, বলব না।'

'আমার বউ মানে তোমার ভাবীকে তোমার কেমন মনে হয়?'

'কেমন মনে হবে, ভালো তো।'

'কেমন ভালো?'

'খুব ভালো।'

'খালি কথার পিঠে কথা বলো না। বুঝে-শুনে বলো।'

ভালো করে আমি বদি ভাইয়ের দিকে তাকাই। বদি ভাই পলকহীন চোখে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। মানুষের চেহারার দিকে ভালো করে

তাকালে অনেককিছু বোঝা যায়, কিন্তু বদি ভাইকে দেখে এ মুহূর্তে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। একেবারে ভাবলেশহীন চেহারা, একেবারে নির্মোহ চেহারা।

পিঠ এলিয়ে দিয়ে বসেছিলেন বদি ভাই, সোজা হলেন। আমার দিকে একটু ঝুঁকে এসে বললেন, 'তোমার ভাবী কিন্তু খুব বড়লোকের ঘরের মেয়ে। ওর বাবা আমাকে কমপক্ষে এক কোটি বার কিনতে পারবে আবার বেচতে পারবে। ওদের বাড়ির বাথরুমটাই হচ্ছে আমাদের বেডরুমের সমান। এবার বোঝো তাহলে।'

'কিন্তু—।' থেমে যাই আমি, কথাটা শেষ করতে ইচ্ছে করে না। বদি ভাই মুচকি হেসে বলেন, 'কিন্তু আমার সঙ্গে বিয়ে হলো কীভাবে সেটাই জানতে চাচ্ছো তো?'

'জি।'

'সেটা শোনার আগে মিষ্টি আর সমুচা নিয়ে আসো। খেতে খেতে কথাটা বলি।' আমার হাতে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট দিয়ে বদি ভাই বলেন, 'পারলে দুটো কোল্ড ড্রিংক্সসও নিয়ে এসো।'

মিষ্টি আনতে যাচ্ছিলাম আমি। বদি ভাই মানা করে আবার বলেন, 'মিষ্টি-টিষ্টি পরে খাই, আগে কথাটা শেষ করি। খুব ইন্টারেস্টিং ঘটনা।

আমি আবার বসে বলি, 'জি, বলেন।'

'তোমার ভাবীকে প্রাইভেট পড়াতাম আমি।'

'ভাবী তখন কোন ক্লাসে পড়তেন?'

'ক্লাস নাইনে। তুমি আমাকে যাই মনে করো অঙ্কে কিন্তু আমি খুব পাকা ছিলাম। ছিলাম কী, এখনো আছি। কিন্তু কম্পিউটারটাই আমি খুব কম বুঝি। আসলে কম্পিউটার বুঝতে হলে নিজস্ব একটা কম্পিউটার থাকা দরকার, সেটা ঘন ঘন নাড়াচাড়া করলেই নাকি একা একাই শেখা যায়। যাক গে, একদিন তোমার ভাবীকে অঙ্ক শেখাচ্ছি, ওই যে ওই অঙ্কটা-একটা বানর এক মিনিটে একটা তৈলাক্ত বাঁশের-।'

'ওইটা তো ক্লাস নাইনের অঙ্ক না বদি ভাই, ক্লাস সেভেনের অঙ্ক!'

'তাই নাকি! তাহলে সম্ভবত চৌবাচ্চার অঙ্কটা করাচ্ছিলাম। ওই যে একটা চৌবাচ্চা একটা পাইপ দিয়ে ১২ মিনিটে ভরিয়ে ফেলা যায়, কিন্তু তিনটা পাইপ দিয়ে ছয় মিনিটে খালি—।'

বদি ভাইকে আবার থামিয়ে দেই আমি, ‘ওইটাও তো ক্লাস নাইনের অঙ্ক না, ক্লাস এইটের।’

‘আসলে হয়েছে কী, ক্লাস সিক্স থেকে ক্লাস টেন পর্যন্ত অঙ্ক করাতাম তো, ভুলে গেছি কোন ক্লাসে কোন অঙ্ক ছিল।’

‘অঙ্কের কথা বাদ দেন, আপনি বিয়ের কথা বলেন।’

‘অঙ্কের কথা বাদ দিয়ে বিয়ের কথা বলা যাবে না, রনজু। তোমার ভাবী অঙ্কে খুব কাঁচা ছিল, তাই অঙ্ক করতে সবসময় ভয় পেত। একদিন কী একটা যেন অঙ্ক করাচ্ছিলাম, হঠাৎ আড়মোড়া ভেঙে বলে, আমি আজ অঙ্ক করব না। আমি বললাম, কেন? তোমার ভাবী বলে কি জানো? একটা—।’

বদি ভাইকে আবার থামিয়ে দেই আমি, ‘তখন তো ভাবী হয় নাই।’

একটু চিন্তা করে বদি ভাই বলেন, ‘ঠিক বলেছে, তখন তো আমাদের বিয়েই হয় নাই, ভাবী হবে কোথা থেকে। তোমার ভাবীর নাম জানো তো?’

‘জি। লতা।’

‘লতা তখন আড়মোড়া ভেঙে বলে, একটা কথা আছে আপনার সঙ্গে।

আমি বলি, বলো।

আমার আজ একটু ঘুরতে ইচ্ছে করছে।

তাহলে আজ আর পড়বে না।

না।

আমি তাহলে আজ আসি।

লতা হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে বলে, আপনি কোথায় যাবেন, আমি তো আপনার সঙ্গে বেড়াতে যাব।

এটা কী করে সম্ভব!

আপনি চাইলেই সম্ভব।

লতা তারপর জোর করে আমাকে বাইরে নিয়ে যায়। সাত-আটটা গাড়ি ওদের। বিশাল একটা গাড়িতে করে নিয়ে যায় আমাকে। এসিওয়ালা গাড়ি, ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছিলাম, কিন্তু লতার দিকে তাকিয়ে দেখি ওর কোনো বিকার নাই, গলার সঙ্গে ওড়নাটা পেচিয়ে দিব্যি বসে আছে।’

এটুকু বলেই বদি ভাই হেয়ারে হেলান দিয়ে আমাকে বলেন, ‘এক কাপ চা হলে মন্দ হতো না।’

‘চা আনব?’

'দাঁড়াও, চা-ও পরে খাই। কথাটা শেষ করেই নেই।'

'জি, সেটাই ভালো।'

'ঘোরাঘুরি শেষ করে লতা বলে কী জানো?'

'কী?'

'আমি আর বাসায় যাব না। আমি মনে করেছিলাম অন্য কোথাও যাবে। বললাম, বাসায় না গেলে কোথায় যাবে।

লতা খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলে, আপনার বাসায় যাব।

আমার বাসায়! আমার বাসায় কেন?

আপনার বাসায় আমার কাজ আছে।

আমি বলি, কী কাজ?

সেটা এখানে বলা যাবে না, বাসায় গিয়ে বলব। আমি ওকে আমাদের বাসায় নেই কীভাবে। তোমরা তো চার-পাঁচ বছর ধরে আমাদের এলাকায় এসেছ, তাই আমাদের অবস্থা সমন্ধে ঠিক জানো না। খুব খারাপ ছিল আমাদের অবস্থা। এখন না হয় এটা ওটা কিনে বাসাটা একটু ঠিক করা হয়েছে। লতার কথা শুনে আমি তো ভেতরে ভেতরে শরমে মরে যাই।

আমার এরকম অবস্থা দেখে ও বলে, আপনি কি আমাকে আপনাদের বাসায় নিতে শরম পাচ্ছেন? আমি কি আর বলি, হ্যাঁ আমি শরম পাচ্ছি। বুকটা একটু টান টান করে বলি, মোটেই না। সঙ্গে সঙ্গে ও আমার একটা হাত টেনে ধরে বলে, চলেন, আর কোনো চিন্তা করতে হবে না, আমি আর এক মুহূর্ত দেরি করব না, এখনই আপনাদের বাসায় যাব।

অগত্যা বাসায় নিয়ে আসতে হলো ওকে। না নিয়ে এসেও কোনো উপায় ছিল না, এমনভাবে ধরেছিল। কিন্তু বাসায় আসার পর লতা আবার কী বলে জানো?'

খুব আগ্রহ নিয়ে আমি বলি, 'কী বলেছিল?'

'আমি আর বাসায় ফেরত যাব না।'

চমকে উঠে আমি, 'মানে!'

বদি ভাই কিছুটা গর্বিত ভঙ্গিতে বলে, 'মানে আর কী, ও আমাদের বাসায় থাকবে।'

'কেন?'

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বদি ভাই বলেন, 'সেটাই তো তোমাকে

বলছি। ও আমাদের বাসায় থাকবে, আমাকে নাকি বিয়ে করবে। শুনে তো আমার শরীর দিয়ে ঘাম ছুটতে থাকে। বলে কি পাগলটা! মার তখন চোখ ভালো ছিল, সবকিছু দেখতে পেত। কথাটা শুনে লতাকে বলে, মারে, এটা কীভাবে সম্ভব, তোমরা বড়লোক মানুষ, আর আমরা গরীব মানুষ। ত্যালে জলে তো মিশ খাবে না মা।

মার কথা শুনে লতা আরো জেদী হয়ে বলে, বড় লোক আছে আমার বাবা আছে, আমি বদি স্যারকে বিয়ে করব। যদি আপনারা এতে রাজী না হন তাহলে হয় আমি বিষ খাব, না হলে গলায় দড়ি দেব।

লতার কথা শুনে মা আরো কাতর হয়ে বলে, তুমি তোমার বাবার ফোন নম্বরটা দাও, আমি একটু কথা বলি।

চিৎকার করে উঠে লতা বলে, না। এটা আমার জীবন, আমি একাই সিদ্ধান্ত নেব। কারো কথা শুনব না আমি। জানো, বিকেল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত বুঝিয়েও কোনো লাভ হয় না। শেষে বিয়েই করতে হয় ওকে।'

'তারপর?'

'তারপরের ঘটনা আরো ইন্টারেস্টিং। আমি—।' কথাটা শেষ করতে পারেন না বদি ভাই। একটা লোক ঢোকেন আমাদের অফিসে। বেশ সৌম্য ধরনের চেহারা ভদ্রলোকের, বয়স প্রায় সত্তরের কাছাকাছি। এখনো বেশ শক্ত-সামর্থ।

সোজা হয়ে বসেন বদি ভাই। সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে বসতে বলেন তাকে।

'ধন্যবাদ।' চেয়ারে বসতে বসতে ভদ্রলোকটি বলেন, 'আমি প্রায়ই এই রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করি। কিন্তু আজকেই আপনাদের সাইনবোর্ডটা চোখে পরল আমার। সম্ভবত নতুন করেছেন এই অফিসটা, না?'

বদি ভাই বেশ ভাব নিয়ে বলেন, 'জি।'

'আমি টেক্সাসে থাকতাম। তেইশ বছর সেখানে থাকার পর দেশে ফিরে এসেছি গত তিন বছর আগে। এখানে আমি একটা ছোট খাটো কৃষি ফার্ম করেছি।'

'খুব ভালো তো। নিজের ক্ষেতের সবজি খাওয়া অনেক স্বাস্থ্যকর। বাজারে যা পাওয়া যায় তাতো কেমিকেল দিয়ে বোঝাই।'

'কিন্তু একটা সমস্যা হচ্ছে কয়দিন ধরে।'

'অসুবিধা নেই। আপনি সমস্যাটা লিখে দিন, আধাঘন্টার মধ্যে সমাধান করে দেব আমরা। রনজু- ।' বদি ভাই আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, 'ওনাকে কাগজ আর কলম দাও।'

ভদ্রলোককে কাগজ আর কলম দিলাম আমি । উনি সেগুলো হাতে নিয়ে বললেন, 'ইংরেজিতে লিখব, না বাংলায় লিখব?'

'আপনার যেটাতে সুবিধা হয় সেটাতে লিখুন, তবে বাংলায় লিখলে আমাদের সুবিধা হয়।' বদি ভাই মুচকি হেসে বললেন।

ভদ্রলোকটাও মুচকি হাসলেন। পাঁচ মিনিটের মধ্যে তিনি সমস্যার কথাটা লিখে দিলেন আমাদের। কাগজটা হাতে নিয়ে বদি ভাই বললেন, 'পচিশ থেকে ত্রিশ মিনিট সময় লাগবে আমাদের, আপনি কি এক কাপ চা খাবেন কিংবা অন্য কিছু।'

'না, আমি কিছু খাব না। আসলে বাইরের কোনো কিছু খাই না আমি। ভালো কথা, আপনাদের পেমেন্ট করতে হবে কত টাকা?

'আগে সমস্যাটার সমাধান বের করি, তারপর দেখা যাবে।'

পঁচিশ মিনিট লাগল না, পনের মিনিটের মধ্যে বদি ভাই সমস্যার সমাধান লিখে ভদ্রলোকটির হাতে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে খুব মনোযোগ দিয়ে পড়তে লাগলেন তিনি। পড়া শেষ করেই তিনি হো হো করে হাসতে হাসতে বললেন, 'ভেরি ইন্টারেস্টিং। খুব ভালো লেগেছে আমার।'

'থ্যাংক ইউ।'

'আমি বাসায় গিয়েই আপনার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করব।' ভদ্রলোক আকাশের দিকে হাত উঁচু করে বললেন, 'বাকী ওনার ইচ্ছা।'

ভদ্রলোকের সম্ভবত অনেক টাকা আছে। আমরা যা টাকা চেয়েছিলাম তার প্রায় দেড়গুণ দিয়ে বললেন, 'আমার সদরুল আনাম। আই অ্যাম ইমপ্রেসড। ওকে, গুড লাক মাই সান।' আমাদের দুজনের সঙ্গেই হ্যান্ডশেক করে চলে গেলেন তিনি।

চেয়ারে আবার হেলান দিলেন বদি ভাই। খুব আয়েশ করে আড়মোড়া ভেঙ্গে বললেন, 'যাও, এবার গিয়ে মিষ্টি আর সমুচা নিয়ে আসো। মিষ্টি দুটো করে নিয়ে এসো।' বলতে বলতে আরাম করে চোখ দুটো বুজে ফেললেন বদি ভাই।

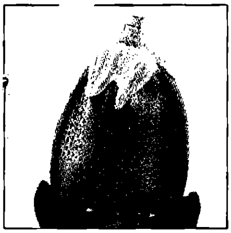

সকালে আগে বদি ভাই যেতেন আমাদের বাসায়, এখন আমি আসি তার বাসায়। কারণ আমরা যেখানে অফিস করেছি সেখানে যেতে হলে বদি ভাইদের বাসার সামনে দিয়েই যেতে হয়। অগত্যা বাসায় ঢুকতে হয়, তারপর আমি আর তিনি গল্প করতে করতে একসঙ্গে অফিসে যাই।

বাসার ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ভাবী বললেন, ‘রনজু, কাল রাতে তুমি বাসায় আসলে না কেন?’

‘রাত হয়ে গিয়েছিল তো, তাই—।’

‘রাত হয়ে গেলে বাসায় আসা যায় না?’

‘যাবে না কেন?’

‘তোমরা নতুন ব্যবসা শুরু করলে, তাই ভালো কিছু রান্না করেছিলাম, কিন্তু তুমি এলে না। আমার একটা ভুল হয়ে গেছে, সকালেই তোমাকে বলা উচিত ছিল।’ ভাবী টেবিলে নাস্তা সাজাতে সাজাতে বলেন, ‘বসো, নাস্তা করো।’

‘আমি তো নাস্তা করে এসেছি।’

‘নাস্তা করে এসেছ, আবার করো।’

‘বদি ভাই কোথায়?’

‘বাথরুমে। ঘুম থেকেই উঠেছে একটু আগে। রাতে ঘুমিয়েছেও অনেক রাত করে। কী কী যেন করছিল, আমি ঘুমিয়ে পরেছিলাম।’

‘আপনাদের সঙ্গে প্রায় চার বছর ধরে পরিচয় আমার, এ চার বছরে একবারও আপনাকে আপনাদের বাবার বাড়ি যেতে দেখলাম না। বাবার বাড়ি যেতে ইচ্ছে করে না, ভাবী?’

‘করবে না কেন!’

‘তাহলে এ চার বছরে একবারও গেলেন না যে!’

'বাবার বাড়ি থাকলে তো যাব। নদী ভাঙা মানুষ আমরা।'

'নদী ভাঙা মানুষ মানে কী?'

'আমাদের বাড়িটা ছিল নদীর ঠিক কাছেই। প্রতি বছর একটু একটু করে ভাঙতে ভাঙতে একদিন নদীতে ডুবে যায় সবকিছু। আমার বাবা কৃষক মানুষ ছিলেন, অন্য আরেক জায়গায় বাড়ি করেন, একদিন সেটাও বিলীন হয়ে যায় নদীতে। আমরা দু বোন স্বামীর ঘরে আছি, তিন ভাই যার যার বউ নিয়ে আলাদা সংসার করছে। কোথায় যাব আমি, কার বাড়িতে বেড়াতে যাব?'

'আপনার ভাইদের কেউ আসে না আপনার কাছে?'

'আগে আসত। এখন সবাই যার যার সংসার নিয়ে ব্যস্ত। কারো বাসায় কারো যাওয়ার সময় নাই। সবচেয়ে বড় কথা সংসারে যদি অভাব থাকে মানুষ তখন অনেক কিছুই ভুলে যায়।' ভাবী খুব মন খারাপ করে বলে।

মনটা খারাপ হয়ে যায় আমারও। ভাবীদের এমন অবস্থা, কিন্তু কাল বদি ভাই যে বলল অন্য কথা! ভাবীর দিকে তাকাই আমি। খুব যত্ন করে টেবিলে খাবার সাজাচ্ছেন। গরম ভাত, আলু ভর্তা আর ডাল। কীসের যেন তরকারীও আছে। গ্লাসে পানি ঢালতে ঢালতে ভাবী বললেন, 'দাঁড়িয়ে আছো কেন বসো, তোমার ভাই একটু পরেই বের হবে।'

'ভাবী, একটা কথা বলি?'

মুখ তুলে ভাবী আমার দিকে তাকান। উৎসুক দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকেন আমার দিকে। আমি হেসে হেসে বলি, 'আপনাদের বিয়ে হলো কীভাবে?'

'আর বলো না। দেখতে শুনতে বোধ হয় খুব একটা খারাপ ছিলাম না।' ভাবী হাসতে হাসতে আঁচল দিয়ে মুখ ঢাকেন।

'খারাপ ছিলেন না মানে কী! সত্যি করে বলছি আপনি এখনো দেখতে খুব সুন্দর। আপনি যখন মাঝে মাঝে সালোয়ার-কামিজ পরেন তখন মনেই হয় না বিয়ে হয়েছে আপনার। কথাটা শুধু আপনাকে বলছি না, মাঝে মাঝে বদি ভাইকেও বলি।'

'তোমার ভাই তখন কী বলেন?'

'স্ত্রীর প্রশংসায় গদ গদ হয়ে হাসেন।'

'তোমাদের এই এলাকায় বেশ কয়েকটা দুষ্ট মানুষ আছে। সেদিন সালোয়ার-কামিজ পরা ছিল আমার, কী একটা কাজে বাইরে যাব। ঘর থেকে

বের হয়ে রিকশার জন্য দাঁড়িয়ে আছি বাইরে। আমাদের দেখে এক লোক এমন ভাবে শিস বাজাল!'

'কোন লোকটা চিনতে পারবেন আপনি?'

'চিনতে পারব না কেন!'

'বয়স কত লোকটার?'

'আটাশ-ত্রিশ হবে। তোমার ভাইয়ের চেয়ে একটু ছোটই হবে।' ভাবী আবার হাসতে হাসতে বলেন, 'বাদ দাও। তুমি যেন কী বলছিলে?'

'আপনাদের বিয়ের কথা জানতে চাচ্ছিলাম।'

'ঈদের আগে একদিন বাজারে গিয়েছি। টুকটাক জিনিস কিনে বাড়িতে ফিরে আসার সময় দেখি, একটা ছেলে আমার পিছু পিছু আসছে। বেশ ভয় লাগছিল। শেষ পর্যন্ত আমাদের বাড়ির সামনে আসে ছেলেটা। তখন একটু সাহস আসে মনে। তাকে জিজ্ঞেস করি, আমার পিছু পিছু এসেছেন কেন আপনি? ছেলেটার কী সাহস, কী বলেছিল জানো? বলেছিল-আপনার বাসা চিনতে এসেছি।

আমি বলি, কেন?

একটা বিয়ের ব্যাপারে।

আমি আবার বলি, কার বিয়ে?

ধরুন আপনার বিয়ে।

আপনার সাহস তো কম না।

ছেলেটি অবুঝের মতো বলে, এতে সাহসের কী হলো! আপনার বিয়ে হবে না! নাকি বিয়ে করবেন না বলে মনস্থির করেছেন?

বিয়ে করব না কেন?

আপনার বাড়িটা চিনে গেলাম। কাল মুরব্বী পাঠাব।' ভাবী আবার হাসতে হাসতে বলে, 'পরের দিনই ছেলেটা মুরব্বী পাঠায়। সবকিছু শুনে বাবা তো রাজী হন না। তার রূপবতী কন্যাকে এরকম বেকার ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেবেন না তিনি। তার পরেও আরো কয়েকবার ছেলেটার মুরব্বীরা আসে, আমাদের আশপাশের মুরব্বীদেরও ধরে, কিন্তু বাবাকে কোনোভাবেই রাজী করানো যায় না। শেষে ছেলে নিজে এসে উপস্থিত। জানো—।' ভাবী শব্দ করে হাসতে হাসতে বলেন, 'ছেলেটা বাবার সঙ্গে এক ঘণ্টা কথা বলে রাজী করিয়ে ফেলে বাবাকে। তারপর তার সঙ্গে বিয়ে হয় আমার।'

'তার মানে ওই ছেলেটা ছিল বদি ভাই।'

'হ্যাঁ, তোমাদের গুণধর এই বদি ভাই।'

ভীষন খটকা লাগছে মনে। কাল বদি ভাই তাহলে সব মিথ্যা বলেছে আমাকে! কিন্তু তার তো মিথ্যা কথা বলার কথা না।

বাথরুম থেকে বের হয়ে ঘরে ঢুকেই বদি ভাই বলেন, 'রনজু, কাল রাতে নতুন একটা আইডিয়া এসেছে আমার মাথায়, দারুন একটা আইডিয়া।'

'এ আইডিয়াটা আমরা পরে কাজে লাগাব; না, এখনই শুরু করব।'

'পরে শুরু করব। তার আগে আমাদের মুশকিল আসান সেন্টারটা দাঁড় করাতে হবে। ভালো কথা, আমাদের প্রচারটা আরো একটু বাড়ানো দরকার। তাতে ক্লায়েন্টের কোনো অভাব হবে না।'

'আমরা কোনো প্রচারই চালাইনি। তাও তো দুদিনে দুটো ক্লায়েন্ট পেলাম। খারাপ না কিন্তু, বদি ভাই।'

'না, খারাপের কথা বলছি না।' বদি ভাইয়ের একটা কাঠের টুল টেনে এনে তাতে বসে বলেন, 'ডায়নিং টেবিলের সব চেয়ার তো অফিসে নিয়ে গেছি। এখন এই টুলে বসেই খেতে হবে। রনজু, তুমিও একটা কিছুতে বসো। দেরি হয়ে গেছে আজ।'

মুখটা হাসি হাসি হয়ে গেল বদি ভাইয়ের, আমারও। সদরুল আনাম সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন আমাদের অফিসের সামনে। তার দু হাতে দুটো ফুল কপি, পায়ের কাছে একটা সবজির ব্যাগ। আমাদের দেখে উনিও হাসতে লাগলেন। তার মানে আমরা সফল। বদি ভাই গলাটা গম্ভীর করে বললেন, 'অফিসে ঢুকেই লোকটার জন্য ভালো করে এক কাপ চা• নিয়ে আসবে, আমাদের দুজনের জন্যও দু কাপ নিয়ে এসো।'

বদি ভাই আনাম সাহেবের একেবার কাছে এসে সালাম দিলেন। সালামের উত্তর দিয়ে তিনি আগের মতোই হাসতে হাসতে বললেন, 'দু জনের সঙ্গে প্রথমে হ্যান্ডশেক করা উচিত আমার। কিন্তু—।' দু হাতের দু কপির দিকে তাকিয়ে তিনি বলেন, 'এ গুলো আমার ফার্মের।' পায়ের কাছে ব্যাগের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এর ভেতর নতুন ধরনের দুটো সবজি আছে, কিছু দেশী সবজিও আছে। সব আমার ফার্মের, আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি।'

'কোনো দরকার ছিল না।' শরম পাওয়ার স্বরে বদি ভাই বলেন।

'দরকার ছিল। আপনারা আমার যে উপকার করেছেন, আমি সারাজীবন কম বেশি সবজি দিয়ে যাব আপনাদের। আমি তো সবজি বিক্রি করি না, শখ আর আনন্দে করি।'

দরজা খুলে সবকিছু পরিষ্কার করার পর বদি আর আনাম সাহেব ঢুকলেন অফিসে। আমি চা আনতে গেলাম। কিছুক্ষণ পর অফিসে এসেই দেখি, আনাম সাহেব কী যেন বলছেন আর হাসছেন। বদি ভাই বললেন, 'নিন চা খান, আর প্রথম থেকে শুরু করুন।'

'থ্যাংক ইউ।' বলে সদরুল আনাম সাহেব চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে বললেন, 'আপনাদের তো আগেই বলেছি আমি টেক্সাসে ছিলাম। অনেক বছর সেখানে থাকার পর মনে হলো এবার দেশে ফেরা দরকার। ছেলে-মেয়েরা ওখানে আছে, ওরা ওখানেই থাক। কিন্তু দেশে এসে কিছু একটা তো করতে হবে, টাকা-পয়সার জন্য না, শরীরটা তো ঠিক রাখতে হবে। অনেকদিন আগে কিছু জমি কিনে রেখে গিয়েছিলাম, ভাবলাম সেখানে একটা কৃষি ফার্ম করব। খুব বড় করে না, ছোট-খাটোর মধ্যেই করব। করলামও।'

বদি ভাই বললেন, 'চা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে আপনার।'

সদরুল আনাম সাহেব আবারো থ্যাংক ইউ বলে চায়ে চুমুক দিলেন। আরেক চুমুক দিয়ে তিনি বললেন, 'ফার্মটা শেষ করার মাস তিনেক পর আমার ঠিক ফার্মের পাশেই একজন এসে বাড়ি করেন। লোকটাকে তেমন শিক্ষিত মনে হয় না আমার। সারাক্ষণ চিল্লাচিল্লি করে আর একে ওকে ধমক দিয়ে কথা বলে।'

'একটা কথা জানা হয় নাই আমার—লোকটা কি প্রথমে চোর প্রকৃতির ছিলেন?' বদি ভাইএকটু ঝুঁকে বসে জিজ্ঞেস করেন।

'না, ওরকম কিছু দেখি তার মধ্যে। উনি ওখানে বাড়ি করার সাত-আট দিনের মধ্যে মুরগি পালতে শুরু করেন। তাও একটা দুইটা মুরগি না, অনেকগুলো মুরগি। কয়েকদিন পর মুরগিগুলো আমার ফার্মে আসা শুরু করে, মাটি আঁচরায়, গাছ নষ্ট করে।'

বদি ভাই থাকার সময় আমি সাধারণত কথা বলি না। হঠাৎ আমি বললাম, 'আপনি ফার্মের চারপাশে দেওয়াল তুলে দিতে তো পারেন।'

'আমি কাঁটা তারের বেড়া দিয়েছি। সাধারণ কৃষি ফার্মে দেওয়াল দিতে হয় না। দেওয়াল দিলে চারপাশ থেকে যে বাতাস আসে তার প্রবাহ নষ্ট হয়ে যায়, গাছের ক্ষতি হয়।'

'খুবই সত্যি কথা।' বদি ভাই মাথা ঝাঁকিয়ে বলেন।

'প্রথম প্রথম আমি মুরগিগুলোকে তাড়ানোর চেষ্টা করতাম। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সেগুলো আবার ফেরত আসত আমার ফার্মে। আমি তো সারাক্ষণ ফার্মটা পাহারা দিতে পারি না।'

'আপনি ওই মুরগির মালিককে কিছু বলেননি।'

'বলেছি। কিন্তু লোকটা তেমন একটা পাত্তা দেয়নি আমাকে। বরং আভাসে-ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছেন-ওগুলো আমাকেই তাড়াতে হবে, আমার ক্ষেতের ফসল আমাকেই রক্ষা করতে হবে। তিনি কোনো কিছু করতে পারবেন না।'

'আপনি কয়বার গিয়েছিলেন ওই মুরগির মালিকের কাছে?'

'বেশ কয়েকবার। প্রতিবারই আমি একই কথা শুনেছি। লজ্জা-শরম ফেলে আপনাদের এখানে আসার আগের দিনও গিয়েছিলাম ওনার কাছে। কোনো লাভ হয় নাই। কেউ কেউ অবশ্য একটা বাজে বুদ্ধি দিয়েছিল-খাবারের সঙ্গে বিষ মিশেয়ে যেন ফার্মে ছিটিয়ে রাখি, মুরগিগুলো এসে ওগুলো খেলে মারা যাবে, ঝামেলা মিটে যাবে। আমার বিবেক সেটা মেনে নেয়নি।'

'তো এখন কী অবস্থা?'

'আপনাদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করলাম, বিরাট সাফল্য পেলাম।'

'কাজটা কীভাবে করলেন একটু বলবেন প্লিজ।'

'আপনারা যেভাবে বলেছেন ঠিক সেভাবেই করেছি। বাজার থেকে বেশ কয়েকটা ডিম কিনলাম, তারপর সেগুলো রাতে চুপচাপ ফার্মের এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখলাম। সকালে আবার মুরগিগুলো আমার ফার্মে আসে, ঘণ্টা খানেক থেকে আবার চলে যায়। আমি তখন ফার্মের বাগানে ঢুকে আমার স্ত্রীকে চিৎকার করে বলি, 'লোপা শুনছ, মুরগিগুলো আমাদের যত ক্ষতিই করুক, আজ কিন্তু আমাদের পুষিয়ে দিয়েছে। এই দেখো, কতগুলো ডিম পেড়ে রেখে গেছে আমাদের বাগানে।' আমান সাহেব হাসতে

হাসতে বলেন, 'আমার স্ত্রীকে আবার বললাম, তাড়াতাড়ি একটা ঝুড়ি নিয়ে আসো, ডিমগুলো বাসায় নিতে হবে তো।'

'আপনার চিৎকার করা কথাটা তারপর ওই মুরগিওয়ালার কানে যায়, না?' বদি ভাই বেশ স্মার্ট ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করেন।

'হ্যাঁ। এখন পর্যন্ত মুরগিগুলো আমাদের বাগানে আর আসেনি। কিছুক্ষণ আগে আমার স্ত্রীকে ফোন করেছিলাম, ও বলল, ওগুলো নাকি বেধে রেখেছেন ওই লোকটা।' সদরুল আমান সাহেব দুটো কপি আর সবজিগুলো আমাদের দিকে এগিয়ে দিয়ে আবার বললেন, 'থ্যাংক ইউ।' তারপর আবার হ্যান্ডশেক করে বললেন, 'থ্যাংক ইউ, ভেরি মাচ।'

দুপুরে আজ বদি ভাইয়ের বাসায় খাব আমরা। একটু পরেই অফিস বন্ধ করে বাসায় যাব, খাওয়া-দাওয়া শেষ করে আবার এসে অফিস খুলব। কিন্তু আমরা একজনের জন্য অপেক্ষা করছি। কিছুক্ষণ আগে ফোন করেছিলেন, কী নাকি একটা মুশকিলে পরেছেন তিনি, সমাধান করে দিতে হবে আমাদের।

বদি ভাই অনেকক্ষণ ধরে কী যেন ভাবছেন। আমি তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম, 'কোনো সমস্যা, বদি ভাই?'

কিছুটা চমকে উঠলেন বদি ভাই। ঝুঁকে বসেছিলেন এতক্ষণ, সোজা হয়ে বসলেন তিনি। ভাবলেশহীনভাবে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'সম্ভবত আমি নিজেই একটা মুশকিলে পরতে যাচ্ছি।'

'কী মুশকিলে বদি ভাই?'

আবার টেবিলের দিকে ঝুঁকে বসলেন বদি ভাই। কিছু বললেন না আমাকে। আমি তবুও দাঁড়িয়ে রইলাম তার পাশে। একটু পর তিনি দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছাড়লেন। আমার মনে হলো বুকের ভেতর থেকে গরম কিছু বাতাস বের করে দিলেন তিনি।

বেশ কিছুক্ষণ পর বদি ভাই আবার সোজা হয়ে বসলেন। আমার দিকে ঘুরে তাকিয়ে বললেন, 'লোকটা তো আসছে না, অফিস বন্ধ করে বাসায় যেতে হবে তো?'

'আর কয়েক মিনিট দেরি করি।'

'প্রচন্ড খিদা লেগেছে।' বদি ভাই মুখটা কুঁচকে বলেন, 'ইদানীং কেমন যেন গ্যাস্ট্রিকের একটা সমস্যা হচ্ছে আমার। পেটটা খালি হলেই চিউ চিউ করে আর অল্প অল্প ব্যথা করে।'

'একটা সিঙ্গারা এনে দেই আপনাকে?'

'না, এখন ভাত খাওয়ার সময়। অন্য কিছু খেলে খিদাটা নষ্ট হয়ে যাবে। তুমি বরং কাজ করো—।' বদি ভাই উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, 'অফিসটা বন্ধ করে দাও। লোকটা এলে দাঁড়িয়ে থাকবে কিংবা ফোন করবে আমাদের। মোবাইলের চার্জও কমে গেছে আমার। চার্জ দিতে হবে বাসায় গিয়ে।'

না, অফিসটা বন্ধ করা হলো না আমাদের। তার আগেই মানুষটা এসে উপস্থিত। বদি ভাইকে দাঁড়ানো দেখে তিনি বললেন, 'স্যরি, একটু দেরি হয়ে গেল, কোথাও যাচ্ছেন নাকি আপনারা?'

'দুপুরের খাবার খেতে যাচ্ছিলাম বাসায়।'

'আপনারা তাহলে খেয়ে আসুন, আমি কোথাও অপেক্ষা করি। আপনারা এলেই আমি আবার চলে আসব।' খুব ভদ্রভাবে বললেন লোকটি, যদিও তাকে দেখে খুব নম্রই মনে হলো আমার।

'না না, আপনাকে অপেক্ষা করানো ঠিক হবে না আমাদের। আপনি বসুন, আপনার প্রবলেমটা শুনি। আশারাখি কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্যার সমাধান দিতে পারব।'

কিছুটা অনিচ্ছা নিয়ে লোকটি বসলেন। বদি ভাইও বসলেন, সঙ্গে সঙ্গে আমিও। 'চা খাবেন।' চেয়ারটা টেনে আরো একটু কাছ ঘেঁসে বদি ভাই বললেন, 'আমাদের এখানে ভালো লাল চা পাওয়া যায়।'

হেসে ফেললেন লোকটি, 'না, চা খেয়ে সময় নষ্ট করতে চাচ্ছি না। আমি দ্রুত আমার সমস্যাটা বলতে চাই আপনাদের।'

'সমস্যাটা কি খুবই ভয়াবহ?'

'আমার কাছে ভয়াবহই মনে হচ্ছে।'

বদি ভাই আমার দিকে তাকালেন, 'রনজু, কাগজ আর কলম দাও।'

কাগজ আর কলম দিলাম আমি বদি ভাইয়ের হাতে। উনি লোকটার দিকে ও দুটো জিনিস এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'আপনি এখানে আপনার সমস্যাটা লিখুন, আশা রাখি আধ ঘন্টার মধ্যে সেই সমস্যার সমাধান লিখে দিতে পারব আমি।'

কলম আর কাগজটা হাতে নিয়ে লোকটা বললেন, 'আপনার পেমেন্ট।' কথাটা শেষ করলেন না তিনি, কিছুটা ইতস্তত ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইলেন বদি ভাইয়ের দিকে।

'পেমেন্ট পরে হবে, আপনি আগে আপনার সমস্যার কথা লিখুন।'

'ডিটেইলস লিখতে হবে তো, না?'

'অতো ডিটেইলস লিখতে হবে না, আপনি আপনার মতো লিখুন, আমি বুঝে নেব।' বদি ভাই চেয়ারে হেলান দিলেন। তাকে দেখে এ মুহূর্তে মনে হচ্ছে, সত্যি সত্যি খুব খিদা লেগেছে তার।

খুব মনোযোগ দিয়ে লিখছেন লোকটি এবং একটু দ্রুতই লিখছেন। সাত আট মিনিটের মধ্যে লেখা শেষ করলেন তিনি, তারপর কাগজটা বদি ভাইয়ের হাতে দিলেন।

কাগজটা হাতে নিয়েই বদি ভাই পড়া শুরু করলেন না, টেবিলের ওপর পেপার ওয়েট দিয়ে চাপা দিয়ে রেখে বললেন, 'আপনি আধ ঘণ্টার মধ্যে সমাধান পেয়ে যাবেন। এই সময়টাতে আপনি আপনার কোনো প্রয়োজনীয় কাজ সারতে পারেন কিংবা কোথাও যেতেও পারেন। তা না হলে এখানেই বসতে পারেন আপনি, কোনো অসুবিধা নেই আমাদের।'

'আমার কিছু কাজ আছে। আমি বরং সেই কাজগুলো সেরেই আসি।' অফিস থেকে বের হয়ে গেলেন লোকটি।

পুরো বিশ মিনিট ঝিম মেরে বসে থেকে সোজা হয়ে বসলেন বদি ভাই। আমার দিকে এক পলক তাকিয়ে বললেন, 'এক কাপ লাল চা নিয়ে আসো তো, একটু কড়া করে নিয়ে এসো। মাথাটা জ্যাম লেগে গেছে। বাচ্চাদের নিয়ে সমস্যা তো, সমাধানটা বের করতে বেশ ধকল গেল ব্রেনের ওপর।' বদি ভাই আবার হেলান দিলেন চেয়ারে।

চা আনার সঙ্গে সঙ্গে চুমুক দিতে শুরু করলেন বদি ভাই। চা'টা শেষও করলেন, লোকটাও এসে হাজির। সামনে সমাধান লেখা কাগজটা তার হাতে দিয়ে বললেন, 'আশা রাখি কালকেই আপনি আবার আমার কাছে আসবেন। ভালো কথা—।' বদি ভাই উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আপনার নামটা জানা হলো না।'

'আমার নাম মোর্শেদ নোমান।'

নোমান সাহেব, 'স্ত্রী ছাড়া সংসার হচ্ছে ভাঙ্গা পাখির বাসার মতো। আমি আপনার জন্য দুঃখিত।'

বাসায় পৌঁছতে পৌঁছতে প্রায় তিনটা বেজে গেল। কিন্তু বাসায় ভাবী নেই।

খালাম্মা তার ঘর থেকে বদি ভাইকে ডেকে বললেন, ‘বইদ্যা রে, এট্টু এদিকে আয় তো।’

রেগে গিয়ে বদি ভাই বললেন, ‘তোমাকে না বলেছি আমাকে বইদ্যা বলে ডাকবা না।’

‘ওইটা তো তোরে আদর কইর‍্যা ডাকি। আয়, আমার কাছে আয়, তোর লগে আমার কিছু জরুরী কথা আছে।’

‘আগে ভাত খেয়ে নেই। প্রচন্ড খিদা লেগেছে। লতা কোথায় গেছে, মা?’ বেশ বিরক্ত হয়ে বলেন বদি ভাই।

‘সেটাই তো তোরে কইতে চাই। এদিকে আয়।’

বদি ভাই খালাম্মার ঘরে যান। পায়ের শব্দ শুনেই তিনি বলেন, ‘তোর সঙ্গে আর কেউ আছে নাকি?’

‘রনজু আছে।’

‘ওরে চইল্যা যাইতে বল।’

‘ও আমার সঙ্গে খাবে। তারপর আবার অফিসে যেতে হবে আমাদের। তুমি কী বলতে চাও বলো।’ বদি ভাই খালাম্মার বিছানার পাশে বসেন। গায়ে হাত রেখে খালাম্মা বলেন, ‘তুই তো শুকায়া গেছস বইদ্যা।’

‘তোমাকে না বললাম, আমাকে বইদ্যা ডাকবে না!’

‘ঠিক আছে ডাকব না। কিন্তু এত শুকায়া গেছস ক্যা? ঠিক মতো খাওয়া-দাওয়া করছ না।’

‘কই শুকিয়ে গেলাম।’

‘এই যে গায়ে হাত দিয়া দেখলাম।

‘তুমি তো চোখে দেখ না, তুমি তাই সব কিছু বোঝ না।’

‘ব্যাটারে, মায়েরা সব বোঝে। ছওয়ালপান প্যাটের ভেতর আসার পর থাইক্যাই সব বোঝে। তোরা তো মনে করছ অন্য কিছু। শোন, ছাওয়ালপান কিন্তু অন্য কেউ না, মায়ের রক্ত থাইক্যাই তৈয়ার হয় তারা।’

‘কী বলবা, বলো?’

‘তোর সাথে যে আইছে, ও কই?’

‘আছে।’

‘তাহলে কথাটা এখন কমু না, পরে তুই যখন একলা থাকবি, তখন কমু। তবে তোরে একটা কথা কই। খালি বাইরের দিকে মন রাখলে চলব

না, ঘরের দিকেও মন রাখতে হইব। ঘরেও তো কেউ না কেউ থাকে, তাদের সাথে কথা বলতে হয়, গপ-সপ করতে হয়।'

'তুমি এসব বলছ কেন, মা?'

'কেন কই সেইট্যা পরে বুঝবি।'

খালাম্মার ঘর থেকে মন খারাপ করে চলে এলেন বদি ভাই। কিন্তু আমাকে দেখেই মুখটা হাসি হাসি করে বললেন, 'মা'র মাথাটা ঠিক নাই। সারাদিন একা একা থাকে তো, এটা-ওটা মনে হয়, মনের ভেতর নানারকম কথা জমা হয়, আমি বাসায় আসলেই গরগর করে সেগুলো বলে ফেলে।'

'ভাবী কোথায় গেছেন?'

'কোনো জরুরী কাজে হয়তো বাইরে গেছে। সেও সারাদিন একা একা বাসার ভেতর থাকে। মা অন্ধ মানুষ, তার সঙ্গে আর কত কথা বলা যায়। তুমি তো জানো তোমার ভাবী বড়লোকের ঘরের মানুষ। এসব নিম্ন মধ্যবিত্তদের স্যাঁতসেতে ঘরে কতক্ষণ মন টেকে তার। তাই হয়তো হাওয়া-টাওয়া খেতে গেছে। আবার হয়তো মার্কেটে টার্কেটেও যেতে পারে।' বদি ভাই খাওয়ার জন্য টুলে বসতে বসতে বলেন, 'তোমাকে তো বলা হয়নি, তোমার ভাবীর বাবা আমাকে মেনে না নিলেও মাঝে মাঝে কিন্তু ওর জন্য টাকা পাঠায়। এই যে মাঝে মাঝে আমার কাছে টাকা থাকে না, আমি তখন কার কাছ থেকে নেই? তোমার ভাবীর কাছ থেকেই তো নেই।' বদি ভাই একটু থেমে বলেন, 'মাঝে মাঝে অবশ্য তোমার কাছ থেকেও নেই।'

'আমার কাছ থেকে আর কত টাকা নেন!'

'যা-ই নেই, নেই তো!'

খাওয়া প্রায় অর্ধেক শেষ হয়েছে, এমন সময় ভাবী ঢুকলেন বাসায়। হাসতে হাসতে তিনি বাসায় ঢুকছিলেন, কিন্তু বদি ভাইকে দেখেই মুখটা ম্লান করে ফেললেন তিনি। গম্ভীর হয়ে বললেন, 'কখন এসেছ বাসায়?'

বদি ভাই হাসার চেষ্টা করলেন, 'এই তো একটু আগে।'

ভাবী একটু থামলেনও না বদি ভাইয়ের কাছে, দাঁড়ালেনও না তার পাশে, এমনকি একটু যত্ন করে বললেনও না-কী খাচ্ছো তুমি? তাকে দেখে মনে হলো, অন্য একটা জগত থেকে এসেছেন তিনি, এখনও অন্য জগতেই আছেন!'

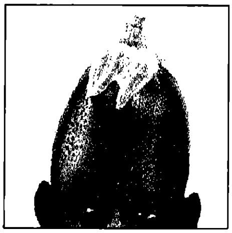

কাল দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা আর অফিসে যাইনি। বদি ভাই অলস গলায় বলেছিলেন, ‘শরীরটা ভালো লাগছে না, মনটাও ভালো না। চলো, আজ আমরা বে-ওয়ারিশ কুকুরের মতো ঘুরি। অফিসটা চালু করার পর থেকে ঘোরাফেরা করার আর সময়ই পাই না।’

খুব মজার একটা অভ্যাস আছে বদি ভাইয়ের। তিনি সারা রাস্তা বেড়াবেন আর খাবেন। খুব দামী কিছু খাবার না, এক টাকা বা দুই টাকার বাদাম, কখনো ভাজা ছোলা, কখনো মুড়ি বানানো, চানাচুর বানানো, এই সব আর কি।

বাদাম খেতে খেতে তিনি হঠাৎ আমার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেন, ‘কথাটা শেষ করা হলো না, রনজু।’

‘কোন কথাটা?’

‘ওই যে আমার বিয়ের কথাটা।’

‘জি।’ আমি কিছুটা গদগদ হয়ে বলি, ‘খুবই মজার একটা ঘটনা, শেষ করুন না, বদি ভাই।’

হাতের ভেতর কয়েকটা বাদাম ছিল বদি ভাইয়ের। সেগুলো আমাকে দিয়ে তিনি বলেন, ‘বিয়ের পরেই ঘটে আসল ঘটনা। লতা বাসা থেকে বের হয়ে এসেছে, কিন্তু রাত হয়ে গেছে বাসায় ফিরছে না ও। সবার মাঝে তো টেনশন। শেষে আমার কাছে ফোন করে ওর এক চাচা। তখন অবশ্য আমার মোবাইল ফোন ছিল না। আমাকে চেয়ে পাশের বাসার টিএন্ডটিতে ফোন করে। ফোনটা ধরেই চমকে উঠি আমি, কারণ লতার ওই চাচার সঙ্গে বহুদিন কথা হয়েছে আমার, গলাটা একেবারে চেনা।’

‘ফোন তখন রেখে দিয়েছিলেন আপনি?’

‘না রেখে উপায় আছে। বাসায় এসে দ্রুত আমি তোমার ভাবীকে কথাটা

বলতেই ও অগ্নিমূর্তি ধারন করে আমাকে বলে, তুমি চুপ করে বসে থাকো। বাকীটা আমি দেখছি।'

'আপনারা কি কোর্টে বিয়ে করেছিলেন, না কাজী ডেকে?'

'তখন তো রাত হয়ে গিয়েছিল, কোর্ট পাব কোথায়। আশপাশের সবাই মিলে কাজী ডেকে বিয়েটা শেষ করা হয়। তারপর তোমাকে আর কী বলব। রাতে আমি আর তোমার ভাবী মিলে একটু সুখ-দুঃখের গল্প করছি, সংসারটা কীভাবে সাজাব সেটা নিয়ে পরিকল্পনা করছি, ঠিক সেই মুহূর্তে অনেকগুলো গাড়ির শব্দ শোনা যায় আমাদের বাড়ির সামনে। একটু পর কলিংবেল বেজে ওঠে আমাদের। মা দ্রুত গিয়ে দরজাটা খুলে দিতেই কে যেন চিৎকার করে বলে, ঘরের ভেতর আর কে কে আছে?

মা বলে, আমাদের সবাই আছে।

সবাই কে কে আছে?

আমার ছেলে আছে, ছেলের বউ আছে।

আপনার ছেলেকে ডাকেন।

না, ডাকা যাবে না।

কেন?'

ওর আজকে বিয়ে হয়েছে, ও এখন বাসর ঘরে আছে।

বাসর ঘরে থাকলে ডাকা যায় না?'

যায়। মা একটু শব্দ করে বলে, আপনারও তো বাসর রাত হয়েছে, হয় নাই? ওই রাতে যদি আপনাকে ডাকা যেত কেমন লাগত আপনার? সেটা আগে বুঝুন, তারপর অন্যকে ডাকতে বলুন।'

হাসতে হাসতে আমি বলি, 'খালাম্মা তো কঠিন একটা ভূমিকা পালন করেছিলেন সেদিন।'

'কঠিন মানে কি, মা না থাকলে সেদিন ভেসে যেতাম। কিন্তু ওরকম কথা শুনে আমি নিজেই বের হয়ে আসি ঘর থেকে। বাইরের রুমে এসে দেখি লতার বাবা দাঁড়িয়ে আছেন সামনে, একেবারে রুদ্রমূর্তিতে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে দেখেই কিছুটা তেড়ে এসে বলেন, এই ইডিয়ট, আমার মেয়ে কোথায়? আমি কিছু বলার আগেই পেছন থেকে লতা সামনে এসে বলে, বাবা, মুখ সামলে কথা বলো, ও এখন আমার স্বামী।'

'একেবারে বাংলা সিনেমার মতো কাজ কারবার।' আমি আবার হেসে হেসে বলি।

'বাংলা সিনেমাই তো। বাংলা সিনেমা তো আর মঙ্গলগ্রহের কোনো কাহিনী নিয়ে করা হয় না, আমাদের আশপাশের ঘটনা-দূর্ঘটনা নিয়েই তো করা হয়।' বদি ভাই বেশ উৎসাহী হয়ে বলেন, 'তারপর কী হয়েছে শোনো—।'

কথাটা শেষ করতে পারেন না বদি ভাই। মোর্শেদ নোমান সাহেব হাসতে হাসতে আমাদের অফিসে ঢোকেন। আমরা দুজনই সোজা হয়ে বসি। একটা চেয়ার টেনে তিনি বসেই বলেন, 'একেবারে একশ পার্শেন্ট কাজ হয়েছে আপনার পরামর্শে।'

'আপনি বোধ হয় অনেক দূর থেকে এসেছেন, হাঁপাচ্ছেন আপনি।'

'আসলে দূর থেকে আসার জন্য হাঁপাচ্ছি না, উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছি। প্রায় ছয় মাস ধরে যে সমস্যার সমাধান করতে পারিনি আমি মাত্র একদিনের মধ্যেই সেটা ফিনিস করে দিয়েছেন আপনি। আমি যে কত আনন্দিত তা বোঝাতে পারব না আপনাকে।'

'আপনি আনন্দিত সেজন্য আমরাও আনন্দিত।'

'ব্যাপারটা আপনারা যেভাবে বলেছেন আমি ঠিক সেভাবেই করেছি। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি যে কাজটা আমি করতে পারব, তা কল্পনাও করিনি আমি।' নোমান সাহেব আবার হাসতে থাকেন, আন্তরিক হাসি।

'ঘটনাটা আপনি প্রথম থেকে একটু খুলে বলুন। আগামীতে এ ধরনের কোনো সমস্যা আসলে যেন আরো ভালোভাবে পরামর্শ দিতে পারি, সেজন্য পুরো ঘটনাটা ভালো করে জানা দরকার আমাদের। তার আগে আমরা চা খেয়ে নেই, লাল চা।'

চা নিয়ে আসলাম আমি। নোমান চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, 'আমি তো আপনাদের আগেই বলেছি আমার স্ত্রী মারা গেছেন চার বছর হলো। আমার দুটো ছেলে, দুটো ছেলেই মহা দুষ্ট। একটা ক্লাস সেভেনে পড়ে, একজন সিক্সে। বড়টা গাড়ি চালানো শিখেছে, এত অল্প বয়সেও খুব ভালো গাড়ি চালায় ও। অবাক হয়ে যাই আমি। লেখাপড়াতেও ওরা তেমন খারাপ না, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ওরা খুব মিথ্যা কথা বলে।'

'মিথ্যা কথা কি কেবল আপনার সঙ্গে বলে, না সবার সঙ্গে বলে?'

'সম্ভবত আমার সঙ্গে একটু বেশি বলে। মা নেই; সব আবদার, অভাব-

অভিযোগ-সব আমার কাছে। সত্য বলুক আর মিথ্যা বলুক, সব আমার কাছেই বলে।'

'কিন্তু ওরা যে আপনার কাছে মিথ্যা কথা বলে, সেটা কবে টের পেলেন?' বদি ভাই খুব আয়েস করে চায়ে চুমুক দিয়ে বলেন।

'প্রতিদিন ওরা প্রাইভেট পড়তে যায় একটা টিচারের কাছে। আমাদের দুটো গাড়ি। একটা আমি ড্রাইভ করি, আরেকটা ড্রাইভার ড্রাইভ করে। কিন্তু প্রাইভেট পড়ার সময় আমার বড় ছেলেই ড্রাইভ করে যায়, ড্রাইভার নিতে চায় না তখন ওরা।

মাস তিনেক আগে একদিন ওরা প্রাইভেট পড়ে হাসি-মুখে বাসায় ঢোকে। সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল তখন। ড্রইংরুমে বসে চা খাচ্ছিলাম তখন। আমি ওদের জিজ্ঞেস করি, লেখাপড়া কেমন চলছে? ওরা খুব উৎসাহী হয়ে বলে, ভালো।

আজ প্রাইভেট টিচার কেমন পড়াল? দুজনের চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করি আমি।

স্যার তো খুব ভালো পড়ান। বড় ছেলে বলে।

সেটা তো আমি জানি, কিন্তু আজ কেমন পড়াল?

আজও খুব ভালো পড়িয়েছেন।

ছোট ছেলের দিকে তাকিয়ে আমি বলি, তোমাকে কেমন পড়িয়েছে?

আমাকেও ভালো পড়িয়েছে।'

'টিচারটা সম্ভবত ভালো।' বদি ভাই বলেন।

'ভালো তো বটেই, না হলে তার কাছে পড়তে দেব কেন। কিন্তু কথা হলো—সেদিন আমার দু ছেলে প্রাইভেট টিচারের কাছে পড়তে যায়নি। ওরা যায়নি দেখে ওর টিচার ফোন করেছিলেন আমাকে। অথচ দিব্যি আমার কাছে মিথ্যে বলে গেল ওরা।'

'আপনি কিছু বলেননি?'

'না, আমি দেখতে চেয়েছিলাম ওরা আরো মিথ্যা বলে কি না? তিনদিন পরেই আবার আমি বুঝতে পারি ওরা প্রতিনিয়ত মিথ্যা কথা বলে আমার কাছে।'

'কীভাবে বুঝলেন?'

'আমার দু ছেলে তো একই রুমে থাকে। একদিন মাঝরাতে ঘুম ভেঙে

যায় আমার। ওদের রুমের কাছে গিয়ে দেখি শব্দ আসছে রুম থেকে। একটু পর খেয়াল করে দেখি কম্পিউটার থেকে আসছে। সকালে উঠে ওদের জিজ্ঞেস করতেই ওরা যেন আকাশ থেকে পড়ে-চোখ-মুখ বড় করে বলে, না তো, আমরা তো সেই কখন ঘুমিয়ে ছিলাম। পরে বুঝতে পারি আমি ঘুমালেই ওরা রাতে কম্পিউটারে গেমস খেলে। আমি তো কম্পিউটার তেমন জানি না, ওরা একদিন স্কুলে গেলেই বাইরে থেকে একটা কম্পিউটার এক্সপার্টকে ডেকে এনে সব গেমস ফেলে দেই কম্পিউটার থেকে। পরের দিন ওরা সকালে ঘুম থেকে উঠে আমাকে বলে, বাবা, তুমি কি আমাদের কম্পিউটারটা ওপেন করেছিলে?

আমি বলি, কেন?'

ওরা একটু আমতা আমতা করে বলে, না, এমনি।

এর পর থেকে ওরা অনবরত মিথ্যা কথা বলা শুরু করে। আমি ভেবেই পাই না, কীভাবে ওদের মিথ্যা বলা বন্ধ করব। কাল সেই সুযোগটা পেয়ে যাই।' নোমান সাহেবের মুখে বিজয়ীর হাসি।

'কীভাবে? সোজা হয়ে বসেন বদি ভাই।

'আপনার কথা মতেই। কাল ওরা বেশ রাতে বাসায় ফেরে। চুপচাপ বসে আছি আমি। ওরা বাসায় ঢুকেই আমার সামনে এসে বড় ছেলেটা বলে, স্যরি, বাবা গাড়ির চাকা পাংচার হয়ে গিয়েছিল, সেজন্য বাসায় ফিরতে এত দেরি হলো। সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছেলেটাও বলে, জি বাবা, হঠাৎ করে চাকাটা পাংচার হয়ে গেল। কী যে মুশকিলে পরেছিলাম না বাবা।

আমি বলি, তা চাকাটা মেরামত করে এনেছো তো?

বড় ছেলেটা কিছুটা লাফিয়ে উঠে বলে, অবশ্যই। না হলে বাসায় পৌঁছলাম কীভাবে?

ভেরি গুড। তোমরা তোমাদের ঘরে যাও। হাত-মুখ ধুয়ে নাস্তা সেরে পড়তে বসো। ঠিক আছে?' নোমান সাহেব আমাদের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'ওরা ওদের ঘরে যেতেই আমি বড় ছেলেকে ডেকে নিয়ে আসি আমার ঘরে। ও আসতেই আমি বলি, গাড়ির কোন চাকাটা পাংচার হয়েছিল, বল তো বাবা।

ও বলে সামনের চাকা।

সামনের কোন চাকা?

ডান পাশেরটা।

বড় ছেলেটাকে ঘরে এক পাশে দাঁড় করিয়ে তারপর আমি ছোট ছেলেটাকে ডেকে নিয়ে আসি। ওকে জিজ্ঞেস করতেই ও বলে, পেছনের বাম পাশের চাকাটা।' নোমান সাহেবের চেহারাটা ম্লান করে বলেন, 'আমি আমার বড় ছেলের দিকে তাকিয়ে বলি, তোমরা আমার সঙ্গে অনেক মিথ্যা কথা বলেছ, যদি আর একবার বলো তাহলে আমি ট্রেনের নিচে ঝাঁপিয়ে পরব। কেউ ঠেকাতে পারবে না আমাকে। তারপর তোমরা যত ইচ্ছে মিথ্যা কথা বলো, কেউ মানা করবে না, কেউ কষ্ট পাবে না, কোনো বাবা তার ছেলেদের এরকম নোংরামিতে একা একা চোখের জল ফেলবে না।'

বদি ভাইয়ের চোখ দুটো ছল ছল করে ওঠে, 'তারপর?'

'আজ সকালে আমার দু ছেলে আমার দু হাত চেপে ধরে বলে, আমরা কখনো মিথ্যা কথা বলব না, বাবা। প্রমিজ। আমাদের মা নেই, তুমি চলে গেলে আমরা কার কাছে যাব। বিশ্বাস করবেন, কথাগুলো বলেই আমার ছেলে দুটো কাঁদতে থাকে।'

মোর্শেদ নোমান সাহেব চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা ছেলে ঢোকে আমাদের অফিসে। খুব চমৎকার চেহারা ছেলেটার, খুব স্টাইলিস্টও। আমার বয়সীই হবে। টেবিলের সামনের চেয়ারটাতে বসে বলে, 'খুব বাজে একটা সমস্যায় পড়েছি আমি।'

বদি ভাই হাসতে হাসতে বলেন, 'সমস্যা মানেই সমস্যা। তাই সব সমস্যাই বাজে।'

'তা ঠিক।'

কাগজ আর কলম এগিয়ে দিয়ে বদি ভাই বলেন, 'আপনার সমস্যাটা এখানে লিখুন, তারপর দেখি কী করা যায়।'

'লিখতেই হবে, মুখে বললে হয় না।'

'হয়। কিন্তু লিখে দিলে সুবিধাটা কী বারবার আপনাকে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করা লাগবে না, কোনো কিছু জিজ্ঞাসার থাকলেই কাগজে চোখ বুলিয়ে নেব আমি।'

'সমস্যটা যে কীভাবে লিখি!'

'কীভাবে লিখবেন-কলমটা হাতে নিয়ে খসখস করে লিখে যাবেন কাগজে।' হাসতে হাসতে বলেন বদি ভাই। 'তার আগে আপনার নামটা বলুন।'

'অমিত সুপ্রিয়।'

'সুন্দর নাম। হ্যাঁ, এবার লিখতে শুরু করুন।'

কয়েক সেকেন্ড বদি ভাইয়ের দিকে ভাবলেশহীনভাবে তাকিয়ে থেকে সুপ্রিয় লিখতে শুরু করে। সে লিখছে, কিন্তু তার চেহারায় লাজের আভা—সমস্যাটা সম্ভবত সত্যি বাজে ধরনের, লজ্জারও।

খুব মন খারাপ করে বদি ভাই বললেন, 'তোমাকে একটা সমস্যার কথা বলেছিলাম, মনে আছে তোমার?'

'জি। বলেছিলেন, আপনি নিজেই একটা মুশকিলে পরতে যাচ্ছেন। বাকীটুকু আর বলেন নাই।'

'আজ বলব। তার আগে তুমি দু কাপ চা নিয়ে আসো। আজকে দুধ চা এনো। রঙ চা খেতে খেতে আর ভালো লাগে না।'

'দুটো সিঙ্গারা আনি?'

'তোমার খেতে ইচ্ছে করছে?'

'না, আপনার জন্য আনতে চাচ্ছি। আপনার তো গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা আছে। পেট খালি থাকলে গ্যাস কিন্তু বেড়ে যায়।'

'ঠিক আছে, আনো।'

চা এনে দেখি চেয়ারে বসেই ঘুমিয়ে পরেছেন বদি ভাই। চা টেবিলে রাখলাম, সিঙ্গারাও। মৃদু শব্দও করলাম টেবিলে, উঠলেন না। বরং একটু একটু নাক ডাকতে লাগলেন। মিনিট খানেকও যায় নাই, হঠাৎ তিনি চমকে উঠে বললেন, 'আচ্ছা, কাল যে ছেলেটাকে একটা সমাধান দিলাম, সে তো এখনো আসছে না।'

'এসে যাবে।'

'স্বপ্নে দেখি কী জানো-মারা গেছে ছেলেটা।'

'কখন দেখলেন?'

'এই তো একটু আগে দেখলাম।' বদি ভাই চায়ের কাপের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ঠান্ডা হয়ে যায়নি তো?'

'সম্ভবত না।'

বেশ আয়েশ করে চায়ে চুমুক দিলেন বদি ভাই। কিছুক্ষণ ঝিম মেরে বসে থেকে বললেন, 'একটা চিঠি এসেছে আমার কাছে।'

'কীসের চিঠি?'

'চাঁদার চিঠি।'

'চাঁদার চিঠি!'

'হ্যাঁ, চাঁদা চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছে।'

'কবে?

'দু-তিন দিন আগে। লিখেছে-বিনা চালানে ভালোই ব্যবসা করছেন আপনি। এবার কিছু ছাড়ুন। আগামী চিঠিতে জানিয়ে দেব কোথায় মাল নিয়ে আসতে হবে। ব্যাপারটা কেবল আপনিই জানবেন, আর কেউ না। আর কেউ জানলে পেপারে ছবি উঠে যাবে আপনার, বুকে রক্ত মাখা ছবি।'

'কী বলছেন আপনি, বদি ভাই!'

'ভয় পেলে?'

'ভয় পাওয়ার মতো ব্যাপার না?'

'মোটেই ভয় পাওয়ার মতো ব্যাপার না।' বদি ভাই আমার পিঠে একটা হাত রেখে বলেন, 'আমি আছি, তোমার কোনো চিন্তা করতে হবে না। আর শোনো—।' বদি ভাই আশপাশে তাকিয়ে বলেন, 'কথাটা কাউকে বলো না। আমি মানুষের মুশকিল আসান করি, আর অন্য কেউ আমাকে মুশকিলে ফেলবে সেটা তো হতে দেওয়া যায় না।'

বিকেলের দিকে অমিত সুপ্রিয় এলো। ওর হাতে একটা দৈনিক পত্রিকা, কিন্তু চেহারাটা কেমন যেন গম্ভীর ওর। বদি ভাই বললেন, 'কোনো সমস্যা?'

'আগের সমস্যাটা মিটে গেছে, কিন্তু নতুন করে আরেকটা সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে।' ম্লান হেসে সুপ্রিয় বলল।

'পরের সমস্যাটাও মিটে যাবে। কোনো চিন্তা নেই, আমি তো আছি।' বদি ভাই চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে বললেন, 'আপনার প্রথম সমস্যাটা কীভাবে সমাধান হলো সেটা আগে বলুন।'

পেপারটা টেবিলের ওপর রেখে সুপ্রিয় বলল, 'অধিকাংশ পুরুষ মানুষ মেয়েদের কাছাকাছি থাকতে চায়, কিন্তু আমি চাই তাদের কাছ থেকে দূরে থাকতে। ইদানীং আমি যেখানেই যাই সেখানেই কোনো না কোনো মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হয় আমার, তারপর ঘনিষ্ঠতা। কিন্তু এভাবে আর কত দিন!'

'ঘনিষ্ঠতা হলে অসুবিধা কী?'

'অসুবিধা তেমন কিছু না, কিন্তু কয়দিন বিয়ের প্রসঙ্গ আসে।'

'আর তখনই মন খারাপ হয়ে যায়, না?' বদি ভাই হাসতে হাসতে বলেন।

'জি। এর সঙ্গে আরো একটা ব্যাপার যোগ হয়েছে-আব্বু-আম্মু এসব টের পেয়ে আমাকে বিয়ে করাতে চাচ্ছেন।'

'কিন্তু এখন বিয়ে করা সম্ভব না।' বদি ভাই আবার হেসে বলেন।

'জি।' সুপ্রিয় টেবিলের ওপর দু হাত তুলে চাপ দিয়ে বসে বলে, 'একবার হয়েছে কী আমার ই-মেইল অ্যাকাউন্টে একটা মেইল আসে। যথারীতি মেইলের উত্তর দেই, মেইলের প্রতি-উত্তরও পাই আমি। তিন মাস এভাবে চলতে থাকে। আমি ভেবেছিলাম, আমার কোনো ছেলে বন্ধুর কাজ এটা। কয়েকদিন পর একটা মেয়ে এসে হাজির আমাদের বাসায়।

ছুটির দিন ছিল সেদিন। আব্বু-আম্মু বাসায়ই ছিলেন, আমিও বাসায় ছিলাম। মেয়েটি এসে সোজা আমাকে চায়। আম্মু বলেন, সুপ্রিয় তোমার কে হয়? মেয়েটি খুব স্মার্টলি বলে, আমার বন্ধু।

কেমন বন্ধু?

খুব ভালো বন্ধু।

তোমার নাম কী?

পিংকি।

মা মেয়েটির আরো একটু কাছে এসে বলে, পিংকি, সুপ্রিয়র তো সব বন্ধুকেই আমি চিনি, কিন্তু তোমাকে তো চিনতে পারলাম না।

এটা কোনো সমস্যা না। আমি আজ সুপ্রিয়কে বিয়ে করতে এসেছি।

মা ততক্ষণে অনেক কিছু বুঝে গেছে। পিংকিকে বলে, তুমি যে সুপ্রিয়কে বিয়ে করতে এসেছো সেটা কি সুপ্রিয় জানে?

জি, কাল এটা জানিয়ে ওকে একটা মেইল করেছি আমি।

ফোন করোনি ওকে?

ওর মোবাইল তো সবসময় বন্ধই থাকে।

মা আর পিংকি কথা বলছে, আর আমি তো আমার ঘর থেকে ওই সব কথা শুনে রীতিমতো ঘামছি। কিছুক্ষণ মা আমার ঘরে এসে বলে, রেডি হয়ে নে, তোকে একজন বিয়ে করতে এসেছে।

অবাক হয়ে আমি বলি, এসব কী বলছ তুমি!

কী বলছি বুঝতে পারছিস না। তুই যদি সম্মতিই না দিবি মেয়েটি তাহলে বাসায় আসে কীভাবে, বাসার ঠিকানাইবা পায় কোথা থেকে।

মেয়েটির সঙ্গে কথা বলে তুমি বুঝতে পারোনি—কোন ধরনের মেয়ে ওইটা? মাকে নরম গলায় জিজ্ঞেস করি আমি।

মেইলে যোগাযোগ করার সময় তুই বুঝতে পারিসনি—কোন ধরনের সঙ্গে খাতির জমাচ্ছিস?

মেইলে ওইসব বোঝা যায় নাকি!

মা খুব রেগে গিয়ে বলে, এবারের মতো মাফ করে দিলাম। যেভাবেই হোক মেয়েটাকে বিদায় করছি আমি। এরপর এরকম কিছু হলে আমি নিজেই তোর বিয়ে দিয়ে দেব। কোনো ওজর-আপত্তি শুনব না।'

বদি ভাই হেসে ফেলেন, 'তারপর আর কোনো সমস্যা হয়নি।'

'আরো দুবার হয়েছিল। দুবার কোনো রকম বেঁচে ছিলাম। তিন দিন ধরে এ ধরনের আরেকটা সমস্যা হচ্ছে। কোনোভাবেই কোনো কিছু করতে পারছিলাম না। শেষে আপনার কাছে আসা।'

'পেপারে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন আপনি?'

'জি।' টেবিলের ওপর রাখা পেপারটা মেলে ধরে সুপ্রিয়, 'এই যে।'

বদি ভাইয়ের পিঠের কাছে এসে দাঁড়াই আমি। পেপারটার দিকে তাকিয়েই হাসি এসে যায় আমার। সুপ্রিয়র বড় একটা ছবি ছাপা হয়েছে, তার নিচে লেখা—

চুপি চুপি বিয়ে করেছিস তুই
তাতেও তোর মুক্তি নেই
খাওয়াতে আমাদের হবেই, অবশ্যই চায়নিজে।
—তোর কাছের বন্ধুরা।

'এখন কী অবস্থা?' বদি ভাই জিজ্ঞেস করেন সুপ্রিয়কে।

'পেপারে এটা দেখে আমার যে মেয়ে বান্ধবীরা ছিল, তাদের অধিকাংশই রেগে গেছে, তারা বলেছে, ওরা আর আমার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রাখবে না।'

'আপনি তো এটাই চেয়েছিলেন।'

'হ্যাঁ।

'তিনদিন ধরে যে মেয়েটা বেশিরকমভাবে সমস্যা করছিল, সে কি কিছু বলেছে?'

'অজস্রভাষায় গালাগালি করেছে, যা মুখে আনা সম্ভব না।'

'আপনি যে বললেন, নতুন আরেকটা সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে?'

'জি। আব্বু-আম্মু ব্যাপারটা মেনে নিয়েছেন, কিন্তু তারা আজকালের মধ্যেই আমার বউকে দেখতে চান। কিন্তু আমি এখন বউ পাব কোথায়? তাদের আমি কীভাবে বুঝাই ওটা একটা ফলস বিজ্ঞাপন ছিল!'

সুপ্রিয়র কাতরতা দেখে বদি ভাই ওর হাতের ওপর একটা হাত রাখেন। মিষ্টি করে হেসে বলেন, 'যেহেতু চুপিচুপি বিয়ে আপনার আব্বু-আম্মু মেনে নিয়েছেন, তাহলে সমাধান একটাই-একটা বিয়ে করে ফেলুন।'

'এখন যে করতে চাচ্ছি না।'

'এখন করলেও করতে হবে, পরে করলেও করতে হবে। সুতরাং করে ফেলাই ভালো। তবে একটা কথা—দাওয়াত দিতে ভুল করবেন না আমাদের।' বদি ভাই খুব আনন্দ নিয়ে বলেন।

সুপ্রিয়র মুখটাও হাসি হাসি হয়ে গেছে, বিয়ের আগে ছেলেদের মুখে যেমন হাসি দেখা যায়, ঠিক সেরকম হাসি।

কাজ করতে ইচ্ছে করছিল না আজ আর। অফিস বন্ধ করে বাসায় যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। একটা মেয়ে এসে ঢোকে আমাদের অফিসে। মেয়েটার দিকে একনজর দেখেই বোঝা যায়, বাচ্চা আছে তার পেটে। বদি ভাই খুব আন্তরিকতা নিয়ে বললেন, 'কোনো সমস্যা, আপু?'

ম্লান হেসে মেয়েটা বললেন, 'জি।'

'কোনো অসুবিধা নেই—।' মেয়েটার দিকে কাগজ আর কলম এগিয়ে দিয়ে বদি ভাই বললেন, 'আপনার সমস্যাটা এখানে লিখুন, সমাধান ইনশাল্লাহ একটা বের হয়ে আসবে। তার আগে আপনার নামটা বলুন।'

'মিতি।'

'সুন্দর নাম। এবার আপনার সমস্যাটা লিখুন।'

কাঁপা কাঁপা হাতে মেয়েটা কাগজ আর কলমটা নিল। কিন্তু কিছু লেখার আগেই সে বলল, 'আপনার অফিসে তো ফ্যান নেই, একটা পাখা হবে আপনার কাছে, খুব গরম লাগছে আমার।' মেয়েটা সত্যি সত্যি ঘামছে। বুকের ভেতর থেকে একটা হাহাকার বেরিয়ে এলো আমার-আমার মা-ও একদিন এরকম ছিল, আমিও এরকম তার পেটের ভেতর ছিলাম। প্রতিটা মায়েরই একইরকম কষ্ট, সৃষ্টি করার কষ্ট!

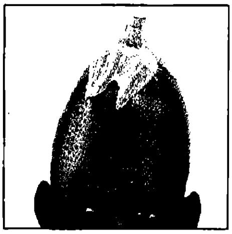

বাজারে গেছেন বদি ভাই। শুনে বেশ অবাক হলাম। কারণ তিনি সাধারণত বাজারে যান না। বাজারে গেলে নাকি মাথা ঘুরতে থাকে তার। এভাবে মাথা ঘুরানোর ফলে বাজারের মধ্যে পড়েও গিয়েছিলেন একদিন, সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়েও গিয়েছিলেন। আশপাশের লোকজন ভেবেছিল মৃগী রোগের কারণে এরকম হয়েছে। অনেকে বলে, এরকম অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলে পায়ের পুরনো চামড়ার জুতা নাকের কাছে ধরতে হয়, রোগীর নাকি জ্ঞান ফিরে আসে তাহলে। যতগুলো মানুষ সেদিন চামড়ার জুতো পরে বাজারে গিয়েছিলেন সবাই একবার করে হলেও তার নাকের সামনে জুতো ধরেছেন। বদি ভাই হাসতে হাসতে বলেছিলেন, সবাই নাকি তার নাকের সামনে কেবল জুতোই ধরেননি, আলতো করে ঘষাও দিয়েছে। এতে নাকের অর্ধেক নাকি ক্ষয় হয়ে গিয়েছিল তার!

বদি ভাইয়ের আজ বাজারে যাওয়ার একটা কারণ আছে। তার এক আত্মীয় আসবেন বাসায়, মাতৃকূলের আত্মীয়। বিদেশে থাকেন তিনি। খালাম্মার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন।

বাজারে না যাওয়ার আরো একটা কারণ আছে বদি ভাইয়ের। একদিন খুব শখ করে বাজার থেকে মাছ নিয়ে এসেছেন, বেশ বড়সড় একটা ইলিশ মাছ। খালাম্মার চোখ তখন ভালো ছিল। খুব আনন্দ নিয়ে মাছটা কাটা শুরু করেন। রাত হয়ে গিয়েছিল অনেক, তবুও মাছটা রান্না শেষ করেন তিনি। গরম গরম ভাত দিয়ে একে একে চারটা মাছ খেয়ে ফেলেন বদি ভাই। মাছটাও ভালো ছিল, রান্নাও হয়েছিল চমৎকার। কিন্তু সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই পেট নেমে যায় তার। সেদিন সতেরবার বাথরুমে যেতে হয়েছিল তার। অবশেষে জানা যায়, মাছটা এতই পচা ছিল, আরো দু-একটা খেলে নাকি কলেরা হয়ে যেত বদি ভাইয়ের।

ভাবী রান্না ঘর থেকে আঁচলে হাত মুছতে মুছতে আমার সামনে এসে বসেন। সঙ্গে সঙ্গে খালাম্মা ডাক দিলেন, 'বউ এদিকে আসো তো?'

বিরক্তি নিয়ে ভাবী বললেন, 'এই মহিলার অভ্যাসই হচ্ছে কারো সঙ্গে কথা বলতে দেখলে আমাকে ডাক দেবেন, যেন কথা বলা মহা পাপ।'

'খালাম্মা তো দেখতে পান না।'

'দেখতে না পেলে কী হবে, পায়ের আওয়াজ শুনেই সব বুঝতে পারেন। তার মধ্যে তুমি এসেছো, তিনি মনে করছেন তোমার সাথে আমি কী না কী করছি।'

'ছিঃ ভাবী, এটা কী বলছেন আপনি!'

'যা সত্যি তাই বলছি। তোমার খালাম্মার ধারনা কী জানো—আমি নাকি প্রেম করে বেড়াই। বাসা থেকে যখন কোনো কাজে বাইরে যাই, আমি নাকি কোনো কাজ করতে যাই না, কারো সঙ্গে দেখা করতে যাই।'

'বুড়ো মানুষ তো!'

'বুড়ো মানুষ হয়েছে তো কী হয়েছে, এভাবে সবসময় কটকট করতে হবে নাকি! শোনো রনজু—।'

কথাটা শেষ করতে পারেন না ভাবী। তার আগেই খালাম্মা আবার ডাক দেন তাকে। ভাবী আবার বিরক্তি নিয়ে বলেন, 'ডাকুক। ডাকলেই যেতে হবে নাকি। সারাদিন বাসায় থাকি। একটু পর পর ডাকতে থাকে—বউ বউ...। ভালো লাগে না আমার।'

'যান না, কী বলে শুনে আসুন।'

'কী আর বলবে।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভাবী খালাম্মার ঘরে যান। ঘরে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খালাম্মা চিৎকার করে বলেন, 'কথা কানে যায় না আমার!'

'আপনি এভাবে কথা বলছেন কেন, আম্মা!'

'এভাবে বলব না তো কীভাবে বলব, গায়ে হাত দিয়ে সোহাগ করে বলব। বড় লোকের বেটি এসে গেছে!'

'আম্মা, আপনি যদি এভাবে কথা বলেন তাহলে কিন্তু আর ডাকলে আসব না। সহ্যের একটা সীমা আছে!'

'আমাকে তো তোমার এখন সহ্য হবেই না। শোনো লতা পাতা, আমি

চোখে দেখতে না পারি, আমার কপালের চোখ নষ্ট হয়ে যেতে পারে, কিন্তু আমার অন্তরের চোখ সব দেখে।'

'আপনার অন্তরের চোখ কী দেখে?'

'সব দেখে, স-ব। কার সাথে ফস্টিনস্টি করো, কার সাথে ঢলাঢলি করো, সব আমি দেখতে পাই। এতদিন মুখ বন্ধ করে ছিলাম, এখন থেকে প্রতিদিন বলব।' খালাম্মা রাগে কাঁপতে থাকেন।

'বলুন, এলাকার লোক ডেকে এনে চিৎকার করে বলুন। এতে আপনারও মান সম্মান বাড়বে, আপনার ছেলেরও বাড়বে।'

'তাই বলব। মান সম্মানের বাকী রেখেছ কিছু।'

'আপনাদের মান সম্মান আছেইবা কতটুকু!'

'যাও, আমার সামনে থেকে যাও। ওই যে আরেকটা মরদ বসে আছে না, তার সঙ্গে ঢলাঢলি করো, মাখামাখি করো। আমি তো চোখে দেখি না, কিচ্ছু দেখতে পাব না। যাও, একটু পর বদি আইস্যা পড়ব।'

মাথা নিচু করে ভাবী আবার আমার সামনে এসে বসলেন। আমি সহানুভূতির স্বরে বললাম, 'বাদ দেন ভাবী। মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলুন সব। বুড়ো মানুষ, সারাদিন একা একা থাকে তো, মেজাজটা তাই খিটখিটে হয়ে গেছে।'

খালাম্মা আবার চিৎকার করে ওঠেন, 'ওই শয়তান পোলা, আমার মেজাজ খিটখিটে? তোর মায়ের মেজাজ খিটখিটে, বাপের মেজাজ খিটখিটে, তোর চৌদ্দগুষ্টির মেজাজ খিটখিটে। বদজাত পোলা, আমার বাড়িতে ঘুরঘুর কেন? সাত সকালে আইস্যা বইস্যা থাকা কেন? কীসের মতলবে এই বাড়িতে আসা আমি বুঝি না। আমি সব বুঝি, বুইঝ্যা বুইঝ্যাই তো বুড়া হইয়া গেলাম। দূর হ এখান থেকে!'

ভাবী ফিসফিস করে বলেন, 'তুমি কিছু মনে করো না, মহিলা পাগল হয়ে গেছে।'

'না, আমি কিছু মনে করিনি ভাবী। আমি তো খালাম্মাকে চিনি।'

'আচ্ছা, তোমার ভাই কি আমার সম্বন্ধে কিছু বলে?'

'আপনার সম্বন্ধে কী বলবে?'

'ভালো-মন্দ কিছু বলে না?'

'কেউ কি তার স্ত্রী সম্বন্ধে খারাপ কিছু অন্যকে বলে, না বলা উচিত?'

ভাবীর দিকে তাকিয়ে হেসে হেসে আমি বলি, 'কেন যেন মনে হচ্ছে আপনি কেনো একটা কারণে কিছুটা অপরাধবোধে ভুগছেন।'

'তোমার তাই মনে হচ্ছে?'

'কিছুটা মনে হলো তো, তাই বললাম।'

'ভালো কথা, তোমার ভাই কখন না কখন আসে, নাস্তাটা সেরে ফেল তো তুমি।' ভাবী প্লেট সাজাতে ব্যস্ত হয়ে পরেন। আমি ভাবীর ব্যস্ততা দেখি, ঠিক ব্যস্ততা দেখি না, চট করে প্রসঙ্গ বদলানোর অভিনয় দেখি।

'ওই ছ্যামরা, এদিকে আয়।' খালাম্মা তার রুম থেকে আমাকে ডাকেন। ইশারা করে ভাবী যেতে না করেন আমাকে। আমি ভাবীকে ইশারা করে বুঝিয়ে দেই গেলে কিছু হবে না।

কিছুটা শব্দ করেই খালাম্মার ঘরে ঢুকি আমি। বিছানার ওপর বসে আছেন তিনি। মাথার ঘোমটাটা টেনে তিনি বলেন, 'ওই যে, খাটের পাশে ছোট টেবিলটা আছে না, পান আছে ওখানে। পানের বাটাটা আইন্যা আমার পাশে বসো।'

জিনিসটা নিয়ে খালাম্মার পাশে বসলাম আমি।

'একটা পান বানায়া দাও আমাকে।'

পানের বাটা থেকে একটা পান বের করে খালাম্মাকে বললাম, 'চুন বেশি দেব, না কম দেব?'

'পরিমাণ মতো দাও। সুপারি দিও, কিন্তু খয়ের দিও না। খয়ের খাইলে মুখ লাল হয়ে যায়। মুখটা তখন পোলাপানের মুখের মতো দেখা যায়। জর্দা এট্টু বেশি দিও।'

কাঁপা কাঁপা হাতে পান বানিয়ে খালাম্মার হাতে দিতেই তিনি দরজার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওখানে কে দাঁড়িয়ে?'

দরজার দিকে তাকিয়ে দেখি ভাবী দাঁড়িয়ে। আমার পান বানানো দেখে মুচকি মুচকি হাসছেন। তিনি যে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে ইশারায় সেটা না করতে বললেন।

'বললাম না ওখানে কে দাঁড়িয়ে?'

'কেউ তো নেই খালাম্মা।'

'ওই ছ্যামরা, মিথ্যা কথা বলবা না আমার সাথে। চোখে দেখি না বলে উল্টা পাল্টা কথা বলবা আমার সাথে। আমার চোখ গেছে, কিন্তু নাক তো

যায় নাই। নাক এখনো ঠিকই আছে। একশ হাত দূর থেকেও ঘ্রাণ পাই আমি। বদির বউ দাঁড়ায়া আছে না ওখানে?'

সরে গেলেন ভাবী। খালাম্মা চিৎকার করে বললেন, 'আমার ওপর নজরদারী! বলি, আমি কি কারো ওপর নজর রাখি?'

'খালাম্মা, আপনি এখন আরাম করে পান খান।'

'দেখেছ, কত বেয়াদ্দপ একটা মাইয়্যা। আমার দরজার সামনে দাঁড়ায়া থাকে, কিন্তু কোনো কথা বলে না।' খালাম্মা পানটা মুখে দিয়ে বলেন, 'শোনো পোলা, তুমি তো আমার বইদ্যার সাথে মেশো। ওরে এট্টু-আধটু বুদ্ধি দিও। সারাজীবন তো এভাবে যাবে না।'

'বদি ভাইয়ের জন্য কোনো চিন্তা করতে হবে না, খালাম্মা। উনি ভালো আছে, ভালো থাকবেন।'

'ভালো আর কই আছে!' খালাম্মা আমার দিকে একটু ঝুঁকে এসে নিচু গলায় বলেন, 'দরজার সামনে বউ এখন দাঁড়িয়ে আছে।'

'না।'

'ভালো কইর‌্যা কও, মিছা কইও না।'

'সত্যি বলছি খালাম্মা, ভাবী চলে গেছেন।'

'চলে গেছে! শোনো—।' খালাম্মা আগের চেয়ে গলা নিচু করে বলেন, 'তুমি একটা কাজ করতে পারবা?'

'কোন কাজ, খালাম্মা?'

'যেই কাজ হোক পারবা কিনা?'

'আগে কাজের কথাটা শুনলে ভালো হতো।'

খালাম্মা আবার দরজার দিকে তাকিয়ে বলেন, 'এখন দেখো তো বউ আবার আইছে কিনা?'

'না, খালাম্মা আসে নাই।'

হাত বাড়িয়ে আমার কাঁধ ধরে কিছুটা নিজের দিকে টেনে নিয়ে আমাকে বলেন, 'আমাদের বউ মানে তোমার পরানের ভাবী মাঝে মাঝেই বাড়ির বাইরে যায়। একদিন খোঁজ নিতে পারবা কোথায় যায়?'

'সেটা কি ঠিক হবে খালাম্মা?'

'অঠিকের কী আছে। আমি মুরব্বী মানুষ, আমি একটা আদেশ করছি

তুমি তা মানবা। না মানলে ভাবব তুমি নিজেও বউয়ের সাথে জড়িত আছো।'

প্রচন্ড অবাক হয়ে বলি, 'কী জড়িত আছি, খালাম্মা?'

'সেটা মুখে বলা লাগব, বুঝে নাও।'

'আপনার কথা শুনে আমি লজ্জা পাচ্ছি, খালাম্মা।'

'লজ্জা পাওয়ার কিছু নাই। আমি যেটা বলি সেটাই সত্যি।' খালাম্মা পান চাবাতে চাবাতে বলেন, 'আমাকে আর একটা পান বানায়া দাও। তারপর এখান থেকে দূর হও।'

দূর হতেই আমি চাচ্ছি। খালাম্মাকে আরেকটা পান বানিয়ে দিয়ে দ্রুত ঘর থেকে বের হয়ে এলাম আমি। কিন্তু দরজার আড়ালে ভাবীকে দেখেই চমকে উঠে কিছু একটা বলতে নেই, তার আগেই মুখে হাত চাপা দেন ভাবী। হাত ধরে পাশের রুমে নিয়ে গিয়ে বলেন, 'দেখেছ, কী নিচু একটা মহিলা। ভাবছি, খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে একদিন মেরে ফেলব আমি।'

'ছিঃ, এভাবে বলে না ভাবী!'

'মাথায় আগুন ধরে যায় মহিলার কথা শুনলে।'

'শাশুড়ি তো।'

'দূর, শাশুড়ির ঘর পুড়ি।' বাইরের ঘরের দরজায় শব্দ হয়। ভাবী দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে দরজাটা খুলে দেন। দু হাতে দু ব্যাগ বোঝাই ঘরে ঢোকেন বদি ভাই। আমাকে দেখেই বলেন, 'আর বলো না, রনজু! বাজার করা আর যুদ্ধ করা একই ব্যাপার।'

'আপনি তো অনেক জিনিস কিনেছেন, বদি ভাই।'

'বাজারে গেলে এই একটা সমস্যা। সবকিছু কিনতে ইচ্ছে করে।'

'আজ তো অনেক দেরি হয়ে গেল, অফিসে যেতে হবে না!'

'ভাবছি আজ অফিসে যাব না।'

'কেন?'

'এমনি। কয়েকদিন তো একটানা অফিস করলাম। একদিন রেস্ট নেই। ভালো-মন্দ বাজার করেছি, আজকে খাব আর ঘুমাব।'

'কালকের মেয়েটা তো আসতে পারে।'

'মনে হয় আজ আসবেন না। সমস্যার সমাধান করতে অন্তত একটা

দিন সময় লাগবে। দেখো, উনি কালকে আসবেন।' বদি ভাই একটা চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, 'সেই চিঠিটা আজকেও পেয়েছি।'

'ওই চাঁদার চিঠি?'

কিছু বললেন না বদি ভাই। উদাস চোখে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এটা নিয়ে আমি ভাবছি না।' তারপর ভাবীর দিকে তাকিয়ে বলেন, 'আমি ভাবছি অন্য একট কিছু নিয়ে।'

'কোনো সমস্যা, বদি ভাই?'

'কঠিন সমস্যা।' বলেই মাথাটা নিচু করে ফেলেন বদি ভাই। তাকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি কাঁদছেন, খুব নীরবে কাঁদছেন।

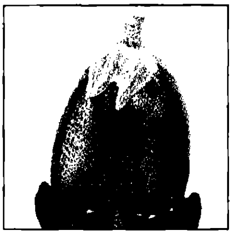

ছোট্ট একটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের অফিসের সামনে। দশ-বারো বছর বয়স হবে তার। খুব ফুটফুটে চেহারা। দেখলেই বুকের ভেতর মায়া এসে যায়। বদি ভাই এগিয়ে গিয়ে ছেলেটার মাথায় একটা হাত রেখে বললেন, 'তুমি কি কাউকে খুঁজছো?'

'জি। এই অফিসের লোকদের খুঁজছি। অফিসটা বন্ধ, তাই অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছি। কিন্তু আমার খুব দরকার।' খুব দুঃখী দুঃখী গলায় বলল ছেলেটি।

'তোমার কি কোনো সমস্যা?'

'শুধু আমার না। আমার একটা ছোট ভাই আছে, বোন আছে-সবার সমস্যা।' ছেলেটি বদি ভাইয়ের দিকে খুব আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে বলে, 'আপনারা এই অফিসের লোক?'

'জি।'

'আপনি কি বদিউর রহমান আঙ্কেল?'

'জি।'

'আমাকে পাঠিয়েছেন সদরুল আনাম আঙ্কেল।'

'কোন আঙ্কেল?'

'ওই যে আঙ্কেলের একটা সবজির ফার্ম আছে, যে ফার্মে পাশের একটা লোকের মুরগি ঢুকে সর্বনাশ করত। আপনার পরামর্শে আঙ্কেল এখন খুব ভালো আছেন।'

'তিনি তোমাকে আমাদের কথা বলেছেন!'

'জি। আনাম আঙ্কেল আমাদের সমস্যাটা একটু-আধটু জানেন, কিন্তু কোনো সমাধান দিতে পারছিলেন না। সমস্যাটা অনেক দিনের তো। প্রায় তিন মাস পর আমার সাথে তার দেখা। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আপনার কথা

বললেন। আঙ্কেল—।' খুব ছল ছল চোখে ছেলেটা বদি ভাইয়ের দিকে আরেকবার তাকিয়ে মাথাটা নিচু করে বলল, 'আপনি কি আমার সমস্যাটা একটু শুনবেন?'

'অবশ্যই।' বদি ভাই আমার হাতে চাবি দিয়ে বললেন, 'অফিসটা খুলে এক প্যাকেট বিস্কুট আর চা নিয়ে আসো।' ছেলেটার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'চা খাও তো তুমি?'

'মাঝে মাঝে খাই।'

'ঠিক আছে, চা আর বিস্কুট খেতে খেতে তোমার সমস্যাটা শুনব। কিন্তু তুমি একা এসেছ কেন? সঙ্গে আর কাউকে তো আনতে পারতে।'

'আমি আর কাকে আনব। আমার ভাইটাও ছোট, বোনটাও ছোট। মা কিংবা বাবাকে তো আনা যাবে না। আনাম আঙ্কেল অবশ্য আসতে চেয়েছিলেন আমার সঙ্গে। আমি আনিনি। কারণ সমস্যাটা তো আমাদের, কারো সামনে সেই সমস্যাটা বলাটা অনেক লজ্জার।'

'আমাদের বলতে কিন্তু আবার লজ্জা করো না।'

'লজ্জা অবশ্য একটু করবে।'

'না, মোটেই লজ্জা করা যাবে না। তাহলে কিন্তু ভালো কোনো সমাধান দিতে পারব না। তুমি কি জানো-ডাক্তার এবং উকিলের কাছে কোনো কিছু গোপন করতে নেই?'

'শুনেছি।'

'এবার আরেকটা শুনে রাখো-পরামর্শকদের কাছেও কোনো কিছু গোপন করতে নেই। পরামর্শক কাদের বলে জানো তো?'

'জি, যারা পরামর্শ দেয়।'

'গুড। কোন ক্লাসে পড় তুমি?'

'ক্লাস সিক্সে।'

'রোল কত তোমার?'

'তিন।'

'এক নয় কেন?' বদি ভাই হাসতে হাসতে বলেন।

'ক্লাস ওয়ান থেকে ফাইভ পর্যন্ত রোল এক-ই ছিল। কিন্তু সিক্সে ওঠার সময় তিন হয়ে গেল।' চেহারাটা আবার দুঃখী দুঃখী করে ফেলে ছেলেটি,

নিচু করে ফেলে মাথাটাও, 'ওই সমস্যার কথা চিন্তা করতে করতেই এমন হয়ে গেল। না হলে ক্লাসে আমি প্রথমই হতাম।'

চা চলে এসেছে। এক প্যাকেট বিস্কুট আর তিনটা সিঙ্গারাও দিয়ে গেল চায়ের দোকানদারের ছেলেটা। বদি ভাই সাধারণত নিজেও চা খেতে পছন্দ করেন না, হঠাৎ হঠাৎ খান, বাচ্চাদেরও চা খেতে দেখলে ভালো লাগে না। বদি ভাইয়ের এ ব্যাপারগুলো বুঝি আমি। তিনি আমাদের সামনের ছেলেটাকে ফ্রি করার জন্য চা আনিয়েছেন। ছেলেটার জড়তা, গুটানো ভাবটা কাটানোর জন্যও এত কথা বলছেন।

'তোমার নামটা তো জানা হলো না।' বিস্কুটের প্যাকেটটা ছিঁড়তে ছিঁড়তে বদি ভাই বলেন।

'সুস্ময়।'

'শুধু সুস্ময়?'

'সুস্ময় ইমতিয়াজ।'

'সুস্ময় তুমি আগে এই বিস্কুট, সিঙ্গারা আর চা খাও, তারপর তোমার সব সমস্যা শুনব আমি।' ইশারায় আমাকে বসতে বলে অফিস থেকে বের হয়ে যান বদি ভাই।

সুস্ময় খুব লাজুকভাবে বিস্কুট খাচ্ছে। ওর খাওয়া দেখে মনে হচ্ছে, একটা বিস্কুট খেতেই ওর আধা ঘণ্টা লেগে যাবে। আমি ওর লাজভাবটা কাটানোর জন্য বলি, 'তোমার কি বেড়াতে ভালো লাগে, সুস্ময়?'

'খুব, খুব ভালো লাগে।'

'কোথায় কোথায় বেড়াতে গিয়েছ তুমি?'

'মালয়েশিয়া গিয়েছি, নিউজিল্যান্ড গিয়েছি, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, ব্যাংকক, ভারত, সুইডেনও গিয়েছি।'

'দেশের ভেতর কোথায় কোথায় গিয়েছ?'

'প্রায় সব জায়গায়।'

'সবচেয়ে ভালো লেগেছে কোন জায়গাটা?'

'বান্দরবান। ওখানে একটা রিসোর্ট আছে না, পাঁচদিন ছিলাম আমরা সেখানে। রিসোর্টের খোলা বারান্দায় বসলে চারিদিকে শুধু সবুজ আর সবুজ দেখা যায়, অন্য কিছু চোখেই পড়ে না। একদিন বৃষ্টি হচ্ছিল, বারান্দায় বসে আছি আমরা। দূরে একটা লম্বা পাহারের দিকে তাকাতেই চমকে উঠি। বৃষ্টি

হচ্ছে সেখানে, কিন্তু তার একপাশে রোদ, আরেকপাশে রঙধনু। তিনটা জিনিস একসঙ্গে পাহাড়ের গায়ে ভেসে উঠেছে। কী যে সুন্দর লাগছিল! আমরা সাধারণত রঙধনু দেখি আকাশে, সেদিনই প্রথম পাহাড়ের গায়ে রঙধনু দেখেছিলাম।' আনন্দে হাসতে হাসতে বলে সুস্ময়।

ছেলেটা আমাদের অফিসে আসার পর থেকে এই প্রথম হেসে উঠল। কী মিষ্টি হাসি, হাসলে গালে টোল পড়ে ওর। চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে খুব স্টাইল করে চুমুক দিল। মনটা এখন একটু ভালো মনে হচ্ছে ওর। আরো একটু ভালো করতে হবে। চেয়ারটা টেনে ওর আরো একটু কাছে বসে বলি, 'বড় হয়ে কী করতে চাও তুমি?'

'কিচ্ছু না।'

'কেন!'

'আমি শুধু রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে চাই। ঘুরতে ঘুরতে পাখি, সবুজ গাছ আর আকাশ দেখতে চাই। কোনো কিছু ভালো লাগে না আমার। এতদিনে বুঝে গেছি, টাকা কিংবা ক্ষমতা হয়ে গেলে অমানুষ হয়ে যায় মানুষ!' দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছাড়ে সুস্ময়। মনটা আবার খারাপ করে ফেলে ও।

প্রায় আধা ঘণ্টা পর কোথা যেন আবার অফিসে আসেন বদি ভাই। চেহারা কেমন যেন কালো কালো লাগছে তার। মনটা যে অসম্ভব খারাপ সেটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু চেয়ারে বসেই তিনি হাসার চেষ্টা করলেন। হাসিটা ঠিক ফুটে উঠল না। ম্লান হাসিতেই তিনি সুস্ময়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বেশ দেরি হয়ে গেল, না?'

'মোটেই না।' সুস্ময় একটু সোজা হয়ে বসে বলে, 'জরুরী কিছু কাজ ছিল সম্ভবত আপনার।'

'চা-বিস্কুট খেয়েছ?'

'জি।'

'আরেক কাপ চা খাবে?'

'না।'

বদি ভাই হেলান দিলেন চেয়ারে। কিছুক্ষণ ঝিম মেরে বসে থেকে বললেন, 'আমি সাধারণত কারো সমস্যা শুনি না, কাগজে লিখে দিতে বলি। তুমি ছোট মানুষ, সম্ভবত বুঝিয়ে লিখতে পারবে না। তুমি বরং তোমার সমস্যাটা আমাকে মুখেই বলো।'

'আমি কিন্তু লিখতে পারব আঙ্কেল!'

'আমি জানি লিখতে পারবে, কিন্তু মুখেই বলো তুমি। একদম সব খুলে বলবে, কোনো কিছু গোপন করবে না।'

'জি, আঙ্কেল।' সুস্ময় আবার জড়ো হয়ে বসে। কিছুক্ষণ সেভাবেই বসে থেকে বলে, 'আমার মা আমাদের বাসা থেকে নানুর বাসায় চলে গেছে। সে আর কোনো দিন আমাদের বাসায় আসবে না।'

'কেন?'

'খুব আনন্দের একটা সংসার ছিল আমাদের। বাবা চাকরি করতেন, অফিস শেষে বাসায় আসতেন, ছুটির দিন সবাইকে নিয়ে বেড়াতে যেতেন। কিন্তু হঠাৎ একদিন চাকরি ছেড়ে দেন বাবা।'

'কেন?'

'ব্যবসা করবেন তিনি, একদিন শুরুও করেন। কিন্তু তার পর থেকেই পাল্টে যান বাবা। খুব সকালে বাসা থেকে বের হয়ে যান, ফেরেনও অনেক রাতে। ছুটির দিনে আর বেড়ানো হয় না আমাদের। কোনো কানো দিন বাবার সাথে আমাদের দেখাও হয় না। আমরা ঘুম থেকে ওঠার আগেই বাসা থেকে চলে যান, আমরা ঘুমানোর পর বাসায় ফেরেন। প্রচন্ড ব্যস্ত হয়ে পড়েন বাবা। সেটাও কোনো সমস্যা ছিল না, কিন্তু একদিন রাতে মা'র চিৎকারে ঘুম ভেঙে যায় আমার। মা চিৎকার করে বাবাকে বলে, কী খেয়ে এসেছ তুমি!

বাবা বলেন, কিছু না।

কিছু না খেলে তোমার মুখ দিয়ে ওরকম গন্ধ বের হচ্ছে কেন?

ব্যবসা করতে হলে এরকম খেতে হয়।

না, এরকম খাওয়া যাবে না। তোমার ছেলে-মেয়ে বড় হচ্ছে, আর তুমি মদ খাচ্ছো!

ছেলে-মেয়ে বড় হওয়ার সঙ্গে মদ না খাওয়ার সম্পর্ক কি? বাবা বেশ উত্তেজিত হয়ে বলেন।

তুমি বোঝ না?

না, আমি বুঝি না। আমার দরকার ব্যবসা, আর কোনো কিছু দরকার নেই আমার।

এভাবে প্রায় প্রতি রাতে বাবার সঙ্গে মা'র ঝগড়া হয়। কয়েক দিন আগে এক রাতে মাকে আঘাতও করে বাবা। সকালে উঠেই মা চলে যায় নানুর বাসায়, আর কোনো দিন আমাদের বাসায় আসবে না!'

'তোমার বাবা তোমার মাকে ফিরিয়ে আনতে যায়নি?'

'গিয়েছিলেন। কিন্তু মা বাবার সাথে দেখাই করেনি।'

'তুমি যাওনি ফিরিয়ে আনতে?'

'গিয়েছিলাম। অনেক বুঝানোর পর মা বলল, তোর বাবাকে যদি নেশা থেকে ছাড়াতে পারিস তাহলে আমি সব ভুলে যাব, না হলে কখনোই আর ওই বাসায় যাব না। তোরা মরে গেলেও না।' সুস্ময় মাথাটা নিচু করে বলে, 'বাবাকে অনেক বুঝিয়েছি, বাবা কেমন যেন হয়ে গেছেন। আমাদের সাথে কথা বলে না, বাসায় খায় না, হাসে না। আঙ্কেল—।' সুস্ময় গলাটা কান্নার মতো করে বলে, 'প্রতি রাতে এভাবে বাবাকে দেখি আর কাঁদি। আর ছোট ভাই আর বোনটা কাঁদে মা মা করে।'

'ব্যাপারটা খুব জটিল।'

'আমরা খুব কষ্টে আছি, আঙ্কেল। আপনি কী একটা কিছু করবেন আমাদের জন্য? তাহলে আমাদের সংসারটা ভাঙন থেকে বেঁচে যায়, আমরা আমাদের মাকে ফিরে পাই। মা ছাড়া থাকতে থাকতে আর ভালো লাগে না, আঙ্কেল। মাঝে মাঝে মনে হয় বাসার ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ি। কিন্তু ছোট ভাই আর বোনটার কথা ভেবে কোনো কিছুই করতে পারি না। লেখাপড়াও করতে পারছি না ভালো করে। চারদিকে কেমন যেন সব অন্ধকার অন্ধকার!'

চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন বদি ভাই। এগিয়ে গিয়ে সুস্ময়ের কাঁধে একটা হাত রেখে বলে, 'চলো, তোমাকে একটা জায়গায় নিয়ে যাব আমি। তারপর যেটা করতে বলব চুপচাপ সেটা করে দেখো, আশা করি সব কিছু আগের মতো ঠিক হয়ে যাবে।'

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সুস্ময় বদি ভাইয়ের হাতটা চেপে ধরে বলে, 'সত্যি বলছেন আঙ্কেল, আপনি সত্যি বলছেন আঙ্কেল। আঙ্কেল, আপনি যা চান আমি আপনাকে তা-ই দেব। আপনি আমাদের বাঁচান, আমাদের সংসারকে বাঁচান।'

সমস্ত মুখ ঘামে ভিজে গেছে সুস্ময়ের, ভিজে গেছে ওর চোখ দুটোও। বাচ্চা একটা ছেলে, বাচ্চা ছেলের মতোই কাঁদছে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। বদি ভাই তার চোখ দুটো আড়াল করে চুপিচুপি মুছে বললেন, 'চলো তো।' হায়, যে বদি ভাইকে কোনোদিন কাঁদতে দেখিনি সেই তিনিও কাঁদছেন, খুব কষ্ট নিয়ে কাঁদছেন।

খুব সকালে আমাদের বাসায় এসে বদি ভাই বললেন, 'রনজু, চলো, আজ অফিসে বসে নাস্তা করব। বাসায় নাস্তা করতে ইচ্ছে করছে না আজ।'

'আপনার তো গ্যাষ্ট্রিক বদি ভাই, বাইরে খাওয়া নিষেধ।'

'দু-একদিন বাইরে খেলে কিছু হয় না। চলো, ফ্রেশ হয়ে নাও। '

সকালের টুকটাক কাজ সেরে দ্রুত বের হয়ে এলাম বদি ভাইয়ের সঙ্গে। আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, বদি ভাইয়ের কিছু কথা আছে, কাউকে বলা দরকার সেগুলো, কিন্তু বলার কোনো লোক পাচ্ছেন না, তাই বলতেও পারছেন না তিনি, সেগুলো এখন আমাকে বলবেন। কিংবা কোনো সমস্যার কারণে বাসায় ভালো লাগছে না, বাসা থেকে বের হয়ে এসেছেন, কিন্তু এত সকালে আর কোথায় যাবেন, চলে এসেছেন আমাদের বাসায়।

বড় রাস্তায় পা দিয়ে বদি ভাই বুক ভরে নিঃশ্বাস টেনে বললেন, 'সকালে ঘুম থেকে ওঠার মজাই আলাদা। ফ্রেশ একটা হাওয়া পাওয়া যায়। অথচ আমরা অধিকাংশ মানুষ সে সময়টাতে ঘুমিয়ে থাকি।'

'সারা রাত ঘুমাতে যতটুকু না মজা, সকালের দিকে ঘুমাতে কিন্তু তার চেয়ে বেশি মজা লাগে।'

'এটাও ঠিক। বিয়ের পর আমরা তো সকালে ঘুম থেকে উঠতামই না। তোমার ভাবী উঠতে চাইত, আমি টেনে ধরতাম। কোনো কোনো দিন সকালে আমাদের নাস্তা করাই হতো না, ঘুম থেকে উঠতে উঠতে দুপুর হয়ে যেত, একেবারে দুপুরের খাবার খেতাম আমরা।'

'এটা তো খুবই ইন্টারেস্টিং ব্যাপার!'

'ঝামেলাও। তোমাকে তো সব কথা বলা হয়নি। বিয়ের পর তোমার ভাবীর বাবা ওই যে আমাকে শাসাতে এসেছিলেন, মার রুদ্রমূর্তিতে সেই যে চলে যান, আর আসেননি। তারপর অবশ্য প্রায়ই এটা ওটা দিয়ে কাউকে

পাঠাতেন আমাদের বাসায়, আমরা রাখতে চাইতাম না, জোর করে রেখে যেত। এখন অবশ্য প্রতি মাসেই বেশ কিছু টাকা পাঠিয়ে দেন তোমার ভাবীর কাছে। তো, তোমাকে যে কথা বলছিলাম-একদিন এভাবে ঘুমিয়ে আছি, দুপুর প্রায় হয়ে গেছে। এরই মধ্যে আমাদের বাসার সামনে গাড়ির শব্দ শোনা যায়, ঘুম থেকে উঠে দেখি তোমার ভাবীর বাবা এসে উপস্থিত। তিনি অবশ্য বাসায় ঢোকেননি, সেদিন তোমার ভাবীর জন্মদিন ছিল, তাই দেখতে এসেছিলেন, বাইরে থেকে দেখেই চলে যান।'

'তারপর থেকে তো ভাবীদের বাসায় যেতে পারতেন আপনি।'

'তা পারতাম, কিন্তু কেন যেন ইচ্ছে করেনি। ওরা অবশ্য বেশ কয়েকবার লোক পাঠিয়েছিল আমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য, এখনো পাঠায়, কিন্তু যাওয়া হয় না। আর আমি যাই না বলে তোমার ভাবীও যায় না। ওই যে অভিমান আর কি।'

বদি ভাইয়ের সব কথা শুনে দ্বিধায় পড়ে যাই আমি। মেলাতে পারি না আমি কোনো কিছুই। ভাবীর পারিবারিক অবস্থা বদি ভাই বলেন এক কথা, ভাবী বলেন আরেক কথা। ভাবী তো বলেন-তারা নদী ভাঙা মানুষ, কৃষক ছিলেন তার বাবা। কার কথা সত্যি?

অফিসের সামনে চলে এসেছি আমরা। হাতে বড় একটা খাবারের বক্স হাতে দাঁড়িয়ে আছে মিতি। আমাদের দেখেই মিষ্টি করে একটা হাসি দিল ও। মনটা ভালো হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

মুখটা এতক্ষণ গম্ভীর ছিল বদি ভাইয়ের। মিতিকে দেখে তিনিও হাসি হাসি করে ফেললেন চেহারাটা। মেয়েটির সামনে গিয়ে বললেন, 'মনটা সম্ভবত ভালো, না?'

মিতি বাচ্চা মেয়ের মতো উচ্ছলতা নিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, অসম্ভব ভালো। এত ভালো যে আমি আপনাদের জন্য খাবার নিয়ে এসেছি, আমি নিজেও খাইনি। আমরা আজ এক সঙ্গে সকালের খাবারটা খাব।'

'আপনার হাজবেন্ডকে আনলে পারতেন।'

'আপনাদের কথা বলেছি ওকে, ও আসতে চেয়েছিল। কিন্তু অফিসে জরুরী একটা কাজ পড়ায় আসতে পারেনি। এক ছুটির দিন ওকে নিয়ে আবার আসব।' মিতি খুব আনন্দ নিয়ে বলে, 'ছুটির দিন আপনাদের এই অফিসটা খোলা থাকে তো?'

'জি, থাকে।'

'আমি তাহলে সামনের ছুটির দিনেই ওকে নিয়ে আসব। আপনারা আমাদের যে উপকারটা করেছেন! আমি জীবনেও এটা ভুলব না।' মিতি ছল ছল চোখে বদি ভাইয়ের দিকে তাকায়।

খুব ভালো করে খেয়াল করে দেখেছি, বদি ভাই এক ধরনের আবেগী মানুষও। কারো চোখ ছল ছল করে উঠলে তার চোখও ছলছল করে ওঠে। বদি ভাই মেয়েটার হাত থেকে খাবারের বক্সটা নিজের হাতে নিয়ে বললেন, 'চলুন, অফিসে বসে আজ মজা করে খেতে খেতে আপনার সব কথা শুনব।' বদি ভাই একটু থেমে বলেন, 'আপনি আপনার স্বামীকে খুব ভালোসেন, না?'

'খুব।' কথাটা বলেই মিতি কেমন যেন একটু লজ্জা পায়। সঙ্গে সঙ্গে বদি ভাই বলেন, 'আপনার স্বামী ভাগ্যবান।'

অফিস খুলে আমরা ভেতরে বসলাম। মিতি দ্রুত খাবারের বক্সটা খুলে যত্ন করে খাবারগুলো মেলতে লাগল টেবিলের ওপর। এক গাদা খাবার নিয়ে এসেছে। বদি ভাই বললেন, 'তিন বেলার খাবার এনেছেন?'

মিতি হাসতে হাসতে বলে, 'কই, তিন বেলার খাবার আনলাম। আরো খাবার আনতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আপনারা কী খেতে পছন্দ করেন সেটা তো জানি না।'

'আমরা সব পছন্দ করি। বিশেষ করে খিদে লাগলে।' বদি ভাই পরোটা ছিঁড়ে মুখে দিতে দিতে বললেন, 'এবার আপনার পুরো ঘটনা খুলে বলুন, খেতে খেতে আমরা ঘটনাটা শুনি।'

মিতি আমাদের দুজনকে খাবার সার্ভ করল, কিন্তু সে নিজে কিছু নিল না। বদি ভাই কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই মিতি বলল, 'খুব খারাপ ধরনের একজন মানুষ আমাদের বাড়িওয়ালা, কিন্তু ওনার বউটা খুব ভালো। বাড়িওয়ালার বড় মেয়েটা বাপের মতোই, চরম অভদ্র। ওনারা থাকেন দোতলায়, আমরা তিনতলায়। রান্নার জন্য আমি বাইরের হলুদ, মরিচ, অন্যান্য মসলার গুড়ো ব্যবহার করি না, নিজে বেটে সেগুলো ব্যবহার করি। এতে শিল আর পাটার ঘষাঘষিতে কিংবা কোনো কিছু ভাঙার জন্য একটু শব্দ হয়। বাড়িওয়ালা এই শব্দটুকুই সহ্য করতে পারেন না। কয়েকবার তিনি আমাদের বলেছেন শব্দ না করতে, কিন্তু আমাদের তো প্রতিদিন খেতে হয়, তাই শিল-পাটা ব্যবহার করতে হয় এবং যথারীতি শব্দও হয়।'

'এরকম সব বাসাতেই হয়।' বদি ভাই এক টুকরো পুডিং মুখে দিতে দিতে বলেন।

'চার-পাঁচ দিন আগে বাড়িওয়ালা বলেছিলেন এভাবে শব্দ করলে বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে। আপনারা আমার অবস্থা দেখছেন, এক মাস পর ডেট দিয়েছেন ডাক্তার, বেশি মুভ করতে নিষেধ করেছেন এ মুহূর্তে। এ সময় বাড়ি চেঞ্জ করব কীভাবে। বাড়িওয়ালা ভাবী অবশ্য আমাদের পক্ষে, কিন্তু বাড়িওয়ালা কোনো কথা শুনতে চান না, তিনি চান এরকম করলে এ মাস শেষেই বাড়িতে নতুর ভাড়াটের জন্য সাইনবোর্ড ঝুলাবেন। কী যে বিপদে পড়েছিলাম! সারাক্ষণ অস্থির হয়ে থাকতাম আর ঘামতাম। প্রেশার উঠে যাওয়ার অবস্থা হয়েছিল। যদিও এ সময় প্রেশার হওয়া খুব খারাপ।'

'এখন সমস্যার সমাধান হয়েছে তো?'

'হ্যাঁ।' মিতি হাসতে হাসতে বলে, 'আপনার বুদ্ধিতেই হয়েছে। আমাদের একটা টেপ রেকর্ডার ছিল, আপনার কথা মতো সেই টেপ রেকর্ডারে শিল-পাটার অনেক ধরনের শব্দ রেকর্ড করলাম। তারপর যখন কোনো মসলা বাটতাম তখন ড্রইং রুমে টেপ রেকর্ডটা ছেড়ে দিতাম। প্রথম দিনেই মসলা বাটার শব্দ শুনে বাড়িওয়ালা দৌড়ে এলেন। কিন্তু আমরা দরজা খুলে দিতেই তিনি খেয়াল করলেন শব্দগুলো টেপ রেকর্ডার থেকে আসছে। কিছুটা বিব্রত হয়ে ফেরত চলে গেলেন তিনি। কালকেও মসলা বাটছিলাম, অবিশ্বাস নিয়ে কালকেও এসেছিলেন তিনি, এসে দেখেন আগের মতোই টেপ রেকর্ডার থেকে শব্দগুলো আসছে। আবার বিব্রত হয়ে ফিরে যান তিনি। কাল রাতে বাড়িওয়ালা ভাবী আমাদের বাসায় এসে বলে গেছেন, বাড়িওয়ালা নাকি তাকে আভাসে-ইঙ্গিতে বাড়ি ছাড়তে না করতে বলেছেন আমাদের। কথাটা আজ সকালে আমাদের জানাতেই আনন্দে আপনাদের এখানে এসেছি। কী যে খুশি লাগছে এখন!'

বদি ভাই আরো এক টুকরা পুডিং মুখে দিয়ে বললেন, 'খুশি লাগারই কথা, তবে আমরাও খুশি। প্রতিটা ক্লায়েন্ট যদি খুশি হয়ে এরকম খাবার নিয়ে আসে, তাহলে কে খুশি হবেন না, বলুন।'

হাসতে থাকে মিতি। হাসলে প্রতিটা মানুষকে ভালো লাগে, মিতিকেও ভালো লাগছে। এ মুহূর্তে সত্যি সত্যি মা মা লাগছে তাকে।

দুপরে আজ বাসায় যাইনি আমরা, অফিসেই খেয়েছি। খাওয়ার পর কেমন যেন ঘুম ঘুম এসেছিল, আমার আগেই নাক ডাকছিলেন বদি ভাই, ঘুমিয়ে পরেছিলাম আমিও। অফিসেই। কিন্তু ঘুম ভাঙল সুষ্ময়ের গলা শুনে।

সুষ্ময় দাঁড়িয়ে আছে আমাদের টেবিলের সামনে। ওর পাশে একটা ভদ্রলোক দাঁড়ানো। দুজনের মুখই গম্ভীর। আমাদের সোজা হয়ে বসা দেখেই সুষ্ময় ভদ্রলোককে দেখিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, 'আমার আব্বু।'

উঠে দাঁড়ালেন বদি ভাই। সুষ্ময়ের আব্বুর সঙ্গে হাত মিলিয়ে বললেন, 'বসুন।' ভদ্রলোক বসতেই বদি ভাই আবার বললেন, 'চা অথবা অন্যকিছু?'

'চা, তবে চিনি কম।' আগের মতোই গম্ভীর হয়ে বললেন ভদ্রলোক।

চা চলে আসতেই বদি ভাই বললেন, 'সম্ভবত আপনি কিছু বলতে এসেছেন, বলুন।'

'আপনারা এটা কী করেছেন!'

খুব শান্তভাবে বদি ভাই বললেন, 'কী করেছি?'

'একটা ছোট ছেলের হাতে বাজে একটা বোতল তুলে দিয়েছেন!'

'বাজে বোতল? বাজে বোতল হলে তো কারো কাছে প্রিয় হওয়ার কথা না। আপনি এটা অন্তত জানেন, ওটা ওকে দেওয়া হয়েছে আপনাকে দেওয়ার জন্য, কারণ আপনি এ ধরনের বোতল প্রতিদিন ব্যবহার করেন।'

'আমি ব্যবহার করলেই ওর হাতে ওটা দিতে হবে?'

'আপনি ব্যবহার করলে দোষ নেই, ও আপনাকে দিলেই দোষ?'

'এটা আপনার জন্য কত বড় ইনসালটিং আপনি জানেন?'

'জানি। জানি বলেই আপনাকে দেওয়ার জন্য ওটা ওকে কিনে দিয়েছি আমি এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস-যদি আপনি বোধ সম্পন্ন কোনো মানুষ হয়ে থাকেন, তাহলে আর কোনো দিন এ ধরনের বোতলের পানীয় গ্রহণ করবেন না।'

ভদ্রলোক অনেকক্ষণ মাথাটা নিচু করে থেকে বলেন, 'আপনাকে ধন্যবাদ। সম্ভবত এরকম একটা ধাক্কা খুব প্রয়োজন ছিল আমার।'

বদি ভাই উঠে দাঁড়িয়ে দু হাত দিয়ে লোকটার একটা হাত চেপে ধরে বলেন, 'এ ধরনের পরামর্শ আপনার ছেলেকে আমি দিতে চাইনি। কিন্তু ও

যখন ওর মায়ের কথা বলল, ওর ভাই-বোনের কথা বলল, আপনাদের সংসারের কথা বলল, সবচেয়ে বড় ব্যাপার আমি যখন ওর চোখে পানি দেখলাম, ভেতরে ভেতরে আমি কাতর হয়ে গিয়েছিলাম, সম্ভবত কেঁদে ফেলেছিলাম আমিও। এত সাজানো গোছানো একটা সংসার আপনাদের!' বদি ভাই মাথাটা একটু নিচু করে বলেন, 'ভাইজান, ভালো একটা বৌ পাওয়া বড় ভাগ্যের ব্যাপার, আপনি ভাগ্যবান!'

মাথাটা নিচু করে ফেললেন ভদ্রলোকও। ওভাবেই নিচের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সুষ্ময়ের আম্মু কাল-পরশু বাসায় চলে আসবে। আপনারা একদিন বেড়াতে আসুন।'

'আসব, অন্তত এই মিষ্টি ছেলেটার জন্য আসব।' বদি ভাই সুষ্ময়ের মাথাটা নিজের বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরেন। কারণ-অকারণে ছলছল করা বদি ভাইয়ের চোখ দুটো ছল ছল করে ওঠে।

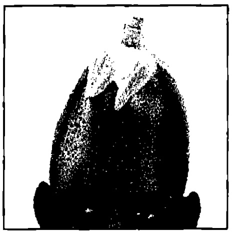

ঘুম ভেঙেছে আজ খুব সকালে। মনটা কেন যেন খারাপ হয়ে আছে। কোনো কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। খারাপ কোনো স্বপ্ন দেখেছি কিনা মনে করতে পারছি না সেটাও। হন্তদন্ত হয়ে বিথী আমার ঘরে ঢুকল। কিছুটা চমকে উঠি আমি। আমার একেবার সামনে এসে দাঁড়ায় ও, 'ভাইয়া, খবর শুনেছিস নাকি?'

বিরক্তি লাগে আমার, 'কী?'

'বদি ভাইয়ের বৌ না পালিয়ে গেছে।'

'পালিয়ে গেছে মানে!' আবারো চমকে উঠি আমি।

'পালিয়ে গেছে মানে পালিয়ে গেছে। কাউকে কিছু না বলে একজনের হাত ধরে বাসা থেকে চলে গেছে।' বিথী হাসতে হাসতে বলল।

'কার হাত ধরে চলে গেছে?'

'ওই যে রতনপুরের খালেদ না কি যেন নাম লোকটার, তার হাত ধরে।'

'খালেদ পাটোয়ারী! খুব বাজে মানুষ তো সে। এর আগেও দুইটা না তিনটা বিয়ে করেছে!

'দুই-তিনটা বিয়ে করেছে তাতে অসুবিধা কী? টাকা আছে বিয়ে করেছে। পুরুষদের আবার বিয়ের কোনো সংখ্যা-টংখ্যা আছে নাকি! যার যত ইচ্ছে সে তত বিয়ে করবে।' বিথী আবার হাসতে থাকে।

'এভাবে হাসছিস কেন তুই!'

'হাসব না তো কাঁদব? একজনের বৌ আরেকজনের সঙ্গে চলে যায়, ব্যাপারটা হাসির না। এই এলাকার যেই শুনেছে সেই হেসেছে।' বিথী হঠাৎ হাসিটা থামিয়ে চলে যেতে যেতে বলল, 'তোর এখন বদি ভাইয়ের বাসায় যাওয়া উচিত।'

ঝিমঝিম করছে মাথাটা। মনটা যা খারাপ ছিল, এখন আরো খারাপ হয়ে

গেল। কী বলব বদি ভাইয়ের কাছে গিয়ে? তাকে কি আমার সান্ত্বনা দেওয়া উচিত? কী ধরনের কথা বলে সান্ত্বনা দেব তাকে? আর এ ধরনের স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে আদৌ কী কোনো কিছু বলা যায়!

কিছুটা দ্বিধা নিয়ে বদি ভাইয়ের বাসায় গেলাম, কিন্তু অবাক হলাম তাকে দেখে। মেঝের সঙ্গে মাথা ঠেকিয়ে পা দুটো উপরে তুলে আছেন তিনি। আমাকে খ্যাস খ্যাস বললেন, 'কেমন আছো, রনজু?'

'আপনার গলার স্বর ওরকম শোনাচ্ছে কেন, বদি ভাই।'

'উল্টো করে দাঁড়িয়ে আছি তো, গলার ওপর চাপ পড়ায় কথাগুলো এমন শোনাচ্ছে।' আবার খ্যাসখ্যাস গলায় বলেন বদি ভাই।

'কিন্তু আপনি এভাবে পা উপরে আর মাথা নিচের দিক দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন কেন?' বদি ভাইয়ের আরো একটু কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলি আমি।

'এটা এক ধরনের যোগ ব্যায়াম।'

'নাম কী এই ব্যায়ামের?'

'তা বলতে পারব না। তবে এই ব্যায়াম করলে মাথা ঠাণ্ডা থাকে, মেজাজ শান্ত থাকে। খুব আরাম পাচ্ছি আমি এখন।'

কিছু জানি না আমি, এরকম ভাব নিয়ে বললাম, 'আপনার হঠাৎ মাথা গরম হলো কীভাবে, মেজাজইবা অশান্ত হলো কী কারণে?'

'তুমি কিছু জানো না!' বদি ভাই পা নামিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, 'এরই মধ্যে এ এলাকার সবাই জেনে গেছে, আর তুমি জানো না?'

'কী ব্যাপার , বদি ভাই?'

'তোমার ভাবী তো আমাকে ছেড়ে চলে গেছে।' কিছুই হয়নি এরকম একটা ভাব নিয়ে খুব স্বাভাবিক গলায় বদি ভাই বললেন, 'যদিও সে আর এখন তোমার ভাবী না।' বদি ভাই কিছু আগ্রহী গলায় বললেন, 'কার সঙ্গে গিয়েছে জানো? আমাদের পাশের এলাকা, ওই যে রতনপুরের খালেদ পাটোয়ারীর সঙ্গে গেছে।'

'আপনি জানলেন কীভাবে?'

'এসব কথা কি চাপা থাকে, রনজু!' হাসতে হাসতে বদি ভাই বলেন, 'আমাকে আর ভালো লাগে না ওর, খালেদকে ভালো লেগেছে চলে গেছে

ওর সঙ্গে। এতে কোনো অসুবিধা দেখছি না কিন্তু আমি। তুমি কী বলো, রনজু?'

'খালাম্মা ব্যাপারটা জানেন?'

'জানবে না কেন? কিছুক্ষণ আগে চিৎকার করে কাঁদল, এখন চুপ হয়ে শুয়ে আছে।'

'ব্যাপারটা আপনি আগে থেকে জানতেন না, বদি ভাই?'

'জানতাম, কিন্তু বিশ্বাস করতাম না। পরশু তোমাকে আর ওই ছেলেটা কী যেন নাম, সুন্ময়কে বসিয়ে রেখে বাইরে গেলাম না। তখন একটা জায়গায় গিয়েছিলাম আমি। দেখি, সেখানে লতা আর খালেদ পাটোয়ারী একসঙ্গে বসে আছে, গল্প করছে আর হাসছে।'

'ব্যাপারটা তো আপনি আগে থেকেই তাহলে জানতেন।'

'তা জানতাম।'

'আপনার কিছু করা উচিত ছিল না!'

'কী করতে পারতাম আমি? যে মেয়েটা আমার সঙ্গে পাঁচ-পাঁচটা বছর সংসার করল, সুখ-দুঃখে একই সঙ্গে থাকল, সেই মেয়েটা হঠাৎ আমাকে ভুলে গেল, আমার সবকিছুকে সে পর করে দিল, এখানে আমি কী করতে পারি। লজ্জায় তো আমার মরে যাওয়া উচিত, রনজু। আমি এতই লজ্জাহীন যে, এখনো বেঁচে আছি আমি, এখনো তোমরা আমার মুখটা দেখছ!' কথা বলতে বলতে হঠাৎ কেঁদে ফেললেন বদি ভাই, 'রনজু, সারাটা জীবন কষ্ট করে গেলাম। আমার বাবা একজন কৃষক ছিলেন, সামান্য কিছু জমি ছিল আমাদের। আমাদের লেখাপড়া করাতে সব বিক্রি করে ফেলেছিলেন তিনি। মা এখন অন্ধ, অথচ অল্প কয়েক হাজার টাকা থাকলে মাকে চিকিৎসা করাতে পারতাম, মা তাহলে এখন অন্ধ থাকত না। এ কথাটা যখনই আমার মনে হয়, বুকটা ফেটে যেতে চায়, রনজু। নিজের জন্মটা বৃথা মনে হয়। লতা'র অনেক কথা বলেছি না তোমাকে? কী, বলেছি না?'

'জি, বলেছেন।'

'লতাকে নিয়ে যা বলেছি তার সব মিথ্যা, ওরাও খুব গরীব ছিল। আমার মনে যে কল্পনাগুলো আসত তাই আমি বানিয়ে বানিয়ে তোমাকে বলতাম। নিজের বাবার তো কিছু ছিল না, মনটা তাই লোভী হয়ে উঠত, যদি ধনবান

একটা শ্বশুর থাকত, যদি টাকাওয়ালা কোনো আপনজন থাকত! সারাক্ষণ শুধু স্বপ্ন দেখতাম। স্বপ্ন দেখতে দেখতেই জীবনটা কেটে গেলে, কোনো স্বপ্ন এসেই ধরা দিল না!' শব্দ করে একটা নিঃশ্বাস ছাড়েন বদি ভাই।

খালাম্মার সম্ভবত ঘুম ভেঙেছে, চিৎকার করে কাঁদা শুরু করেছেন তিনি। কী কষ্টকর সুরে তিনি কাঁদছেন! তার কান্না শুনে চোখে পানি এসে গেল আমার।

বদি ভাই বললেন, 'চলো, অফিসে যাই, কাজ-কর্ম করি। বাসায় আর ভালো লাগছে না।'

'খালাম্মাকে একা রেখে যাবেন?'

'না, আমার এক ফুপু এসেছেন, মার পাশে বসে আছেন তিনি।'

অফিসে ঢুকেই বদি ভাই বললেন, 'চা আর পাউরুটি নিয়ে আসো। চায়ে পাউরুটি ভিজিয়ে খাব।'

খুব দ্রুত চা আর পাউরুটি নিয়ে আসলাম আমি। পাউরুটি ছিড়ে বদি ভাই চায়ে ভেজালেন, কিন্তু মুখে দিতেই প্রচন্ড শব্দে কেঁশে উঠলেন তিনি। মুখ থেকে পাউরুটির টুকরোটা পড়ে গেল মাটিতে। হাতের পাউরুটিটা টেবিলে রেখে অল্প অল্প কাশতে কাশতে তিনি বললেন, 'খেতে পারব না রনজু। গলা থেকে বুকের ভেতরটা পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে, শুকিয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেছে।' কেঁপে উঠল বদি ভাইয়ের গলাটা, কান্নাজড়িত গলা, বুকের ভেতর থেকে উঠে আসা কষ্টকর গলা!

পরিপাটি করে চুল আঁচড়ানো একটা মাঝবয়সী লোক ঢুকলেন অফিসে। চোখ দুটো হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে মুছে বদি ভাই বললেন, 'কিছু বলবেন আপনি?'

'জি, আমি একটা সমস্যায় পড়েছি। যদি একটু—।' লোকটা খুব বিনয়ী গলায় বললেন, 'আসলে আপনাদের কাছে কীভাবে সমস্যার কথাটা বলতে হবে তাতো জানি না।'

'আপনি স্বাভাবিকভাবেই বলুন, আমি শুনছি।'

কেমন যেন গুটিয়ে গেলেন লোকটা। একটু কুঁজো হয়ে বসে বললেন, 'একটা স্কুলের মাস্টার আমি। ছাত্রদের আমি অঙ্ক শেখাই। আমার বাড়ির পাশে নুতন একটা বাসা হয়েছে, খুব প্রভাবশালী মানুষের বাসা। তিনি প্রতিদিন তার বাসার সমস্ত ময়লা আমার বাড়ির সামনে এসে ফেলেন। কিন্তু আমি কিছু করতে পারি না, ভয়ে বলতেও পারি না।'

'না, পারারই কথা।' বদি ভাই লোকটার দিকে একটু ঝুঁকে বসে বলেন, 'আপনি কি সিনেমা দেখেন, হিন্দী সিনেমা?'

'দু-একটা দেখেছি।'

'লাগে রাহো মুন্নাভাই দেখেছেন?'

'না।'

'দেখলে আপনার সমস্যার সমাধান আপনি নিজেই বের করতে পারতেন।' বদি ভাই ম্লান হেসে বলেন, 'ওই প্রভাবশালী লোকটা যখনই আপনার বাড়ির সামনে ময়লা ফেলবেন, ঠিক তখনই হাসি হাসি মুখে ওই ময়লাগুলো সেখান থেকে তুলে আপনি ময়লা ফেলার নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলবেন। এভাবে বেশ কয়েকদিন কাজটা করুন। যদি ওই প্রভাবশালী লোকটা হাত-পাওয়ালা মানুষ হয়, আপনার এ বিনয় দেখে সে আর কখনো ময়লা ফেলবে না আপনার বাড়ির সামনে।'

মাস্টার সাহেব বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে উঠে যান। বদি ভাই অবাক তাকিয়ে থাকেন লোকটার দিকে।

'আমাকে এক গ্লাস পানি খাওয়াতে পারবে, রনজু?' বদি ভাই আমার দিকে ফিরে বলেন।

'পানি তো আপনার সামনেই আছে, বদি ভাই।'

বদি ভাই টেবিলের দিকে তাকিয়ে গ্লাসটা হাতে নিয়ে বলেন, 'মানুষের কত সমস্যার সমাধান করে দেই আমি, কিন্তু আমার সমস্যার কোনো সমাধান আমি এখনো খুঁজে পাইনি। রনজু, তুমি কি বলতে পারবে, কেন?'

'আমি জানি না, বদি ভাই।'

'আমিও না।' বলেই গ্লাসের সবটুকু পানি নিজের মাথায় ঢেলে দেন বদি ভাই। সমস্ত মাথা ভিজে গেছে তার। সেই ভেজা মাথাটা টেবিলে রেখে তিনি

বলেন, 'আজ আমি অনেকক্ষণ ঘুমাব, রনজু, অনেকক্ষণ। সম্ভবত লতাও একদিন কোনো সমস্যায় পড়বে, সেদিন ও আমার কাছে আসবে। ও না আসা পর্যন্ত আমি আর একটা মানুষকেও কোনো পরামর্শ দেব না। দেখো, সত্যি দেব না। আমার মরা বাপের কসম।'

বদি ভাই কাঁদছেন। মাথার জল আর চোখের জল এক হয়ে গেছে তার এ মুহূর্তে। প্রতিনিয়ত দুঃস্বপ্ন দেখার পর যেমন নিচু হয়ে যায়, সেভাবে মাথাটা নিচু করে ফেললেন তিনি টেবিলের ওপর—যেন অন্তহীন প্রতীক্ষা তার, লতা একদিন আসবে, লতার মতো জড়িয়ে ধরবে তাকে, খুব আপন করে, খুব মমতা দিয়ে।